অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন, কখন সফলতা লাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়েরা কৌলিক ধর্মানুসারে ধর্মযাজক ব্যবসায়ী। তাঁহারা বর্তমান সময় পর্যন্ত সমভাবে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।"

রামকান্ত রায়ের তিন বিবাহ ছিল: প্রথমা নিঃসন্তান, দ্বিতীয়া তারিণী দেবী, তৃতীয়া রামমণি দেবী। তারিণী দেবীর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ জগমোহন ও কনিষ্ঠ রামমোহন এবং এক কন্যা ছিল। রামলোচন নামে রামমোহনের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ দিকে অধিকাংশ সময়ই একটি তুলসী উদ্যানে বসিয়া সর্বদা হরিনাম করিতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

রামমোহনের জীবনের প্রথম চৌদ্দ বৎসর প্রধানতঃ তাঁহাদের রাধানগরের বাড়ীতেই কাটে। বাড়ীতেই রামমোহনের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক মৌলভীর নিকট পারস্য ভাষাও শিখিতে আরম্ভ করেন। সেকালে পারস্য ভাষা রাজদরবারে প্রচলিত ভাষা ছিল। ভদ্রবংশীয় বালকেরা সকলেই পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। বাড়ীতে কিছুদিন পড়াশুনা করিবার পর রামমোহন পারস্য ও আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত হন। আরবী ভাষায় এরিষ্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণতর ও মার্জিত হইল। এই সময়ে রামমোহন মুসলমানী ধর্মশাস্ত্র কোরান অধ্যয়ন করিলেন। কোরান এবং পারস্য ভাষায় সুফীদিগের গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া বোধ হয় তাঁহার মনে এই সময় হইতেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া আসে। পরবর্তী কালে হাফিজ্, মৌলানা রুমি, শামীজ তাব্রিজ প্রমুখ সুফী কবিদিগের কবিতাসকল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের বস্তু ছিল। পারস্যের সুফীদিগের ধর্মমতের সঙ্গে বেদান্ত মতের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার নামে একজন সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গে রাধানগরে চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় রামমোহনের পরিচয় হয়। ইনি পরবর্তী কালে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দ অবধূত নামে খ্যাত হন। ইঁহার সংস্পর্শে রামমোহন সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন এবং তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট হন।

সত্যাগ্রহী

"সত্যকে স্বীকার ক'রে রামমোহন তাঁহার দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করিয়াছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট।" —রবীন্দ্রনাথ

রামমোহনের বয়স তখন ষোল কি সতের বছর। এই সময়ে তিনি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশ, পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে পর্যটন করেন।

সেকালে দেশে সুশৃঙ্খলা ছিল না, যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। সেই দুঃসময়ে দুর্গম পথ ভ্রমণ করিয়া দূরদেশে যাওয়া বালক রামমোহনের একান্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়-চিত্ততার পরিচয় দেয়। সেই সময়ে দেশের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীরা দল বাঁধিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইত। বোধ হয় বালক রামমোহন ইহাদেরই কোন দলের সঙ্গে মিশিয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়েই দুর্গম গিরিশ্রেণী পার হইয়া তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিব্বত গমন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম।" ইহার মধ্যে তিব্বত অন্যতম। তাঁহার তিব্বত যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল, বৌদ্ধধর্মের বিষয় জানা। রামমোহনের অনুসন্ধিৎসু ও সর্বদা-সচেতন মন সব-কিছু জানিবার জন্য চির-ব্যগ্র ছিল। পরবর্তী কালে তাঁহার এই ভ্রমণ-কাহিনী নিজের সম্পাদিত "সংবাদ-কৌমুদী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা আর পাওয়া যায় না।

তিব্বতে যাইয়া তাঁহাকে একবার বিষম বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তিব্বতে সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পুরোহিতকে লামা বলে।

তিব্বতীরা লামাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে। তাহারা বলে, লামা জগতের সৃষ্টি ও স্থিতির কর্তা। নির্ভীক ও সত্যসন্ধ রামমোহন এই ভয়ানক অন্যায় কথা সহিতে পারিলেন না। তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ফলে, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। তাঁহাকে মারিবার জন্য তিব্বতীরা ক্ষেপিয়া উঠিল। এই বিপদের সময় কোমল-হৃদয়া তিব্বতী রমণীরা তাঁহাকে বাঁচাইলেন। এই ঘটনা তাঁহার তরুণ হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাই তিনি চিরদিন নারীসমাজের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখে কুমারী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন—"রামমোহনের সুকোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয়, চল্লিশ বৎসর পরেও, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই সময়ের ঘটনা সকল স্মরণ করিত। তিনি (রামমোহন) নিজে বলিয়াছিলেন যে, তিব্বতবাসী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।" এইরূপে নানাদেশ বেড়াইয়া রামমোহন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল রামমোহন কাশীতে থাকিয়া হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। কাশীতে থাকিবার সময়ে তিনি ইংরাজীও শিখিতে আরম্ভ করেন।

সত্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন, রামমোহন তাহা কঠিন ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতেন। তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাধীন চিত্তটি কোন কিছুতেই নতি স্বীকার করিত না। ইহার পরিচয় তিনি প্রথম জীবনে যেমন দিয়াছেন, সারাজীবনও তেমনি সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন।

১৮০৩ সালে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। পিতার জীবিত কালে রামমোহন লক্ষ্য পথে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ঈপ্সিত ব্রত উদ্‌যাপনের পথ উন্মুক্ত হইল। পিতৃবিয়োগের পর রামমোহন মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন।

এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতুল-মুয়াহীদিন' প্রকাশ করেন। ইহা পারস্য ভাষায় লেখা। ইহার অর্থ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার।' ইহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে তিনি অনেক আরবী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক মতের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেই তাঁহার মনের ভিতরকার পরিচয় সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহারই লেখা আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার নাম 'মনাজারাতুল আদিয়ান' বা বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা। উহা পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা পাওয়া যায় নাই।

বৈষয়িক কর্ম

রামমোহন প্রথম জীবনে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তিই দেখাশোনা করিতেন। পরে কলিকাতায় তিনি কোম্পানির কাগজের ব্যবসা, সিবিলিয়ানদিগকে টাকা কর্জ দেওয়া প্রভৃতি ব্যবসাও করিতেন। রামমোহন নয় বৎসর চাকুরি করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে মাত্র ১ বছর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। বাকি কয় বছর তিনি ডিগবী সাহেবের খাস মুন্‌শীর কাজ করিয়াছেন। তাঁহাকে লোকে ডিগবীর দেওয়ান বলিত। এই সকল কার্য করিয়া রামমোহন যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি তালুক ও কলিকাতায় কয়েকটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। ডিগবী ছাড়াও তাঁহার আরো দুই জন সিবিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক জন কলেক্টর উড্‌কোর্ড—ইহার অধীন তিনি ফরিদপুরে (সেকালে ইহার নাম ছিল ঢাকাজালালপুর) দেওয়ান ছিলেন। ফরিদপুরের পর রামমোহন কিছুকাল মুর্শিদাবাদে থাকেন। সেকালে আমাদের দেশীয় লোকের

পক্ষে রাজ-সরকারে সবচেয়ে বড় চাকুরী ছিল দেওয়ানী। উহা বর্তমানকালের শেরেস্তাদারের পদ। ডিগ্‌বী সাহেব যথাক্রমে রামগড়, ভাগলপুর ও রঙ্গপুরের কালেক্টার ছিলেন। সে সময়ে এদেশীয় কর্মচারীদিগকে সাহেব কর্মচারীরা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিত, কাজেই তাহাদের অবস্থাও অত্যন্ত অসম্মানজনক ছিল। এই জন্য রামমোহন চাকুরী গ্রহণ করিবার সময় ডিগ্‌বী সাহেবকে বলিলেন, 'আমি কার্যের জন্য আপনার সম্মুখে আসিলে, আমাকে আসন দিতে হইবে এবং আমার উপর সামান্য আম্‌লাদের ন্যায় হুকুম জারি করিতে পারিবেন না। একথা লিখিয়া আপনি স্বাক্ষর করিয়া দিন, তবেই আমি চাকুরী গ্রহণ করিব।' ডিগ্‌বী সাহেব উহা স্বাক্ষর করিয়া দিলেন, রামমোহন চাকুরী গ্রহণ করিলেন। বোধ হয়, ডিগ্‌বী সাহেব পূর্ব হইতেই রামমোহনে প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই রামমোহন এই চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা এই স্পর্ধাশীল লোকটির কথায় একজন য়ুরোপীয় কালেক্টারের সেকালে এতটা উদারতা দেখাইবার মত মনোবৃত্তি হইত না। রামমোহনের আত্মমর্যাদা-জ্ঞান অত্যন্ত সজাগ ছিল।

রামমোহন অত্যন্ত স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন। আর একটি ঘটনা বলিতেছি। ডিগ্‌বী যখন ভাগলপুর বদলি হইয়া যান, রামমোহনও সেখানে যান। ১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি ভাগলপুর পৌঁছেন। রামমোহন পাল্কী চড়িয়া যাইতেছিলেন। সেখানকার কালেকটর স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন এক ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন দেশী লোককে তাঁহার সাম্‌নে দিয়া চাপরাসী বরকন্দাজ লইয়া যাইতে দেখিয়া ফ্রেডারিকের অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া পাল্কী হইতে রামমোহনকে নামিতে বলিলেন। কিন্তু রামমোহনের পাল্কী থামে না দেখিয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া পাল্কী আটকাইলেন। তখন রামমোহন

পাল্কী হইতে নামিয়া ভদ্রভাবে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সাহেব রাগিয়া লাল। তাহার গালাগালি থামে না দেখিয়া রামমোহন পাল্কীতে যাইয়া বসিলেন এবং হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। এই অপমানের প্রতিকারের জন্য রামমোহন বড়লাটকে প্রতিবাদ জানাইলেন। ইহাতে ফল হইল। স্যর ফ্রেডারিকের উপর আদেশ হইল, দেশীয় লোকের সঙ্গে ভবিষ্যতে যেন এরূপ বচসা না করেন। এই আবেদনটি ইংরেজিতে লিখা ছিল, ইহাই হয়ত রামমোহনের প্রথম ইংরেজি রচনা (১২ই এপ্রিল, ১৮০৯)।

এই সময়ে দেওয়ানের কার্য অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তখন অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই ছিল। একজন য়ুরোপীয় কালেক্টারের পক্ষে এই সমস্ত জটিল নথিপত্র ও দলিলাদি ঘাঁটিয়া বিচার করা শক্ত ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে দেওয়ানের মতামতেরই এসব ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল এবং বিশ্বস্ত দেওয়ানের উপর কালেক্টারদের একান্ত নির্ভর করিতে হইত। এই জন্য রামমোহনকেও ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। ডিগ্‌বী সাহেব রামমোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সততার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করিতেন।

এই সময়ে রামমোহন ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, কাশীতে অবস্থানকালে তিনি প্রথম ইংরাজী শিখেন। তাহা সামান্য মাত্র। তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর। এই প্রাপ্তবয়সে তিনি অধিকতর পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত ডিগ্‌বী সাহেবের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি এত সুন্দর ও শুদ্ধ ইংরাজী লিখিতেন যে ডিগ্‌বী সাহেব নিজেও তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। য়ুরোপ হইতে ডিগ্‌বী সাহেবের নিকট যে সকল সংবাদ-পত্র আসিত, রামমোহন তাহা সযত্নে পড়িতেন। এই সময় হইতেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁহার

পরিচয় লাভ হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঘটনা, বিশেষ ভাবে নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান ও বীরত্ব তাঁহাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিত।

রামমোহন পরবর্তী কালে 'কেন উপনিষদ্' ও 'বেদান্তের চূর্ণক' ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডিগ্‌বী সাহেব বিলাতে যাইয়া উহা পুনর্মুদ্রিত করেন। উহার ভূমিকাও তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি রামমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামমোহন যখন রংপুরে ছিলেন, সেই সময়ে সারা দিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যাকালে আপনার বাড়ীতে ধর্মালোচনা করিতেন। অনেক মাড়োয়ারী সেখানে আসিতেন। তাঁহাদের জন্য রামমোহন 'কল্পসূত্র' প্রভৃতি জৈনদিগের ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। রামমোহন এই সান্ধ্য সভায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বলিতেন। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেন। ইনি রংপুর জজকোর্টের দেওয়ান ছিলেন এবং পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 'জ্ঞান-চন্দ্রিকা' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার অনুগত অনেক লোক ছিল। তাহাদের দ্বারা রামমোহনের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই সকল অনিষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও রামমোহন অ-জেয় ও অ-নতই রহিলেন।

১৮১৪ সালে ডিগ্‌বী সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। সেই বছরই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রামমোহন কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার জীবনে এক বিচিত্র কর্মবহুল অধ্যায় আরম্ভ হইল।

রামমোহন কেমন ছিলেন

(যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের কথা)

রামমোহন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ সুশ্রী ও সুগঠিত ছিল। তাঁহার শরীরটি দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট উচ্চ ছিল। তাঁহার সুবৃহৎ মস্তিষ্ক দেখিয়া বিলাতের বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক যত বড় হয়, রামমোহনের মাথা তাহাদের চেয়েও অনেক বড় ছিল। বিলাতে রামমোহনের চিকিৎসক তাঁহার পাগড়ীটি ষাট বৎসর যাবৎ পরম যত্নে রাখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাতে যাইয়া উহা আমাদের দেশে লইয়া আসিয়াছেন। উহা এত বড় যে অনেক বড়-মাথাওয়ালা লোকের মাথায়ও উহা বড় হয়।

রামমোহনের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ ছিল। তিনি সমস্ত দিনের মধ্যে বার সের দুধ পান করিতেন। শোনা যায়, তিনি নাকি একবারে একটি আস্ত পাঠার মাংস খাইতে পারিতেন।

রামমোহন যখন কলিকাতায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার আরম্ভ করেন সেই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী একদল লোক তাঁহাকে মারিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া রামমোহনের সিংহবীর্য গর্জিয়া উঠিল—"আমাকে মারিবে? কলিকাতার লোক আমাকে মারিবে? তাঁহারা কি খায়?" রামমোহনের নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল।

রামমোহন মাংস ভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজেও নিয়মিত মাংস খাইতেন। তিনি বলিতেন, বাঙালী জাতিকে অধিকতর বলশালী হইতে হইলে, তাহাদের মাংস খাওয়া একান্ত দরকার।

রামমোহন বাইশ বৎসর বয়সের সময় ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এই অধিক বয়সে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেও কতিপয় বৎসর পরে তিনি ইংরাজীতে সুদক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত দশটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন—সংস্কৃত, পারসি, আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক্ ও হিব্রু। সেকালে তাঁহার মত অত-বড় পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ্ এদেশে কেহ ছিল না। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

রামমোহনের মেধা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। পরম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। একদিন তিনি প্রাতঃস্নান করিয়া নির্জ্জন গৃহে সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ পড়িতে বসিলেন। এদিকে দুপুর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। কেহ সাহস করিয়া গম্ভীর-প্রকৃতি রামমোহনের তপোবিঘ্ন ঘটাইতে পারিল না। যখন তিনি পড়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই একদিনে একাসনে বসিয়া তিনি নাকি সমগ্র রামায়ণখানা শেষ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের মেধাশক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। একবার এক পণ্ডিত রামমোহনের নিকট কোন একখানি তন্ত্র বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন দেখিলেন, তিনি উক্ত গ্রন্থ কখনও পড়েন নাই। পণ্ডিতকে বলিলেন, আপনি কাল ঠিক এই সময়ে আসিবেন, বিচার হইবে। রামমোহনের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল না। পণ্ডিতটি চলিয়া গেলে, তিনি শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে ঐ পুঁথিখানি আনিলেন। সমস্ত দিনে উহা পড়িয়া ফেলিলেন। পরদিন যথাসময়ে পণ্ডিত আসিলেন। সে দিন তর্কে রামমোহনের নিকট পরাস্ত হইয়াই পণ্ডিত মহাশয়কে ফিরিতে হইয়াছিল। একবার মাত্র পড়িয়াই রামমোহন সমস্ত বইখানি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম কথা নয়।

রামমোহন অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করিতেন। রাত্রি দুইটা তিনটার আগে কোন দিন ঘুমাইতেন না। তাঁহার পড়ার ঘরে একটি বড় ঘুরানো গোল টেবিল ছিল। উহার উপর অনেক বই থাকিত। যখন যে-খানি দরকার পড়িত টেবিলখানি ঘুরাইয়া দিতেন, বই হাতের কাছে আসিয়া পড়িত, তাঁহাকে উঠিয়া বই আনিতে হইত না।

রামমোহন ছেলেপিলেদের খুব ভালবাসিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বড় সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। মহর্ষি তখন আট নয় বছরের বালক। মহর্ষি লিখিয়াছেন—

"রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে পর আমি রামপ্রসাদের সহিত রাজাকে দেখিতে যাইতাম। রাজার উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি দোলনা ছিল। রমাপ্রসাদ ও আমি উহাতে দুলিতাম। কখনও কখন রাজা আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া, তিনি দোলনার উপর উঠিয়া বসিতেন এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।

"রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকট যাইতে পারিতাম। একদিন প্রাতঃকালে আহারের সময় মধু দিয়া রুটি খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "বেরাদর, আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।" কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময়ে তাঁহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সরিষার তৈল মর্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী সমূহ শক্ত ছিল। তৈলমর্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুষ্পার্শ্বে এক খণ্ড বস্ত্র মাত্র; তাঁহার এই প্রকার মূর্তি দেখিয়া বালক বলিয়া

আমার মনে ভীতিসঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি একঘণ্টারও অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতাসকল আবৃত্তি করিতেন।

"আমি নিচুফল অতিশয় ভালবাসিতাম। যখন রাজা দেখিতেন যে, আমি বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌদ্রতাপে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, 'বেরাদর, এখানে এস, তুমি যত নিচু চাও, আমি দিব। রৌদ্রে বেড়াইতেছ কেন?' তখন তিনি মালীকে আমার জন্য সুপক্ক নিচুসকল আনিতে বলিতেন।"

রামমোহন নিজের শরীরের অত্যন্ত যত্ন লইতেন। উহা ভগবানের মন্দির বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের লোকদের ন্যায় তাঁহারও বাবরী চুল ছিল। চুলগুলির অতিশয় যত্ন করিতেন এবং সেজন্য কেশবিন্যাসে তাঁহার অনেক সময় যাইত। এক কথা উল্লেখ করিয়া একদিন তাঁহার প্রিয় শিষ্য তাঁরাপদ চক্রবর্তী বলিলেন, "আপনি কি 'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে' গানটি শুধু পরের জন্যই লিখিয়াছিলেন?" রামমোহন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "বেরাদর, ঠিক বলিয়াছ, ঠিক বলিয়াছ।" রামমোহনের কোন ত্রুটির কথা যে-কেহ উল্লেখ করিয়া বলিলে, তিনি তাহা অত্যন্ত উদারভাবে গ্রহণ করিতেন।

এখানে বলা আবশ্যক, রামমোহন তাঁহার বন্ধু ও স্নেহাস্পদদিগকে পরম প্রীতিভাবে 'বেরাদর' বলিয়া ডাকিতেন। বেরাদর পার্সি শব্দ, উহার অর্থ ভাই। বেরাদর কথাটি তাঁহার মুখে বড়ুই মিষ্টি শোনাইত।

রামমোহন একদিকে যেমন তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অপরদিকে আবার তেমনি বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। তাঁহার নিকট

দরিদ্র বা ধনী সকলেই সমভাবে সমাদর পাইত। সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহনও স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। একবার বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, সেই সময়ে রামমোহনের একজন বন্ধুও উপস্থিত হন। রামমোহন উভয়কে সমান আদরে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

একদিন রামমোহন চোগা-চাপকান পরিয়া বৌবাজারে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, এক তরকারীওয়ালা তাঁহার বোঝা নামাইয়া তাহা আর তুলিতে পারিতেছে না। কেহ লোকটাকে সাহায্যও করিতেছে না। তখন রামমোহন নিজে যাইয়া লোকটার বোঝা মাথায় তুলিয়া দিলেন।

রামমোহনে পৌরুষ তেজস্বিতা ও কুসুম-কোমল কমনীয়তা একাধারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নীচতা ও ক্ষুদ্রতা রামমোহন অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিতেন। একবার কলিকাতার তদানীন্তন বিশপ মিডিলটনের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিশপ কথায় কথায় রামমোহনকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। খৃষ্টান হইলে রামমোহনের অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইবে, তাহাও বলেন। এই কথা শুনিয়া রামমোহন বিশপটির উপর এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করেন নাই।

রামমোহনের একটি দিনলিপি এখানে লিখিতেছি।

'রামমোহন খুব ভোরে উঠিতেন। প্রত্যেহ ভোরে বেড়াইতে বাহির হইতেন। স্নানের পূর্বে তিনি উত্তমরূপে শরীরে তৈলমর্দন করিতেন। দুইটি জোয়ান লোক তাঁহার গায়ে তৈল মালিশ করিয়া দিত এবং শরীর ডলিয়া দিত। এই সময় তিনি মুগ্ধবোধের সূত্র পড়িতে থাকিতেন। স্নানের পর ভারতীয় প্রথায় জোরাসন করিয়া বসিয়া আহার করিতেন। পূর্বাহ্নে তিনি মাছভাত ও দুধ খাইতেন। ইহার পর সাধারণতঃ দুটা পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজকর্ম

করিতেন। তৎপর বৈকালে তাঁহার সাহেব বন্ধুদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। রাত্রে তিনি বিলাতি নিয়মে মুসলমানী খাবার খাইতেন—পোলাও, কোপ্তা, কোর্মা ইত্যাদি।

রামমোহন বাড়িতে থাকিতেও মুসলমানী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে ভালবাসিতেন। পায়জামা, চোগা-চাপকান ও পাগড়ী না পরিয়া বাড়ির বাহির হইতেন না। সর্ব্বদা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন। বিলাতে মৃত্যুকালেও তাঁহার যজ্ঞসূত্র অঙ্গে সংলগ্ন ছিল। মুসলমানদের অনুকরণে কখনও খালি মাথায় বসিতেন না। ব্রহ্মসভায় যাইবার সময়েও তিনি বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন—ঈশ্বরের রাজ-দরবারে যাইতে হইলে তাহার যোগ্য পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবন —নির্যাতন ও উৎপীড়ন

"মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোন সার্থকতা নেই। ভেসে-চলার দল মানুষের ভাসার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দিবেন, তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই।"

—রবীন্দ্রনাথ

সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অতি শৈশবেই বিবাহ করিতেন। তাহাদের মধ্যে বহু বিবাহও প্রচলিত ছিল। রামমোহনও এই সামাজিক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার তিন বিবাহ। প্রথম বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হয়। সে বালিকা শৈশব অতিক্রম না করিতেই মারা যায়। রামমোহনের যখন নয় বছর বয়স, সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুনর্বার বিবাহ দেন। এই বছরই আর একটি মেয়ের সঙ্গেও তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

রামমোহনের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ রাধাপ্রসাদ ১৮০০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ।

রামমোহন তখন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহার বিরুদ্ধে এক মকদ্দমা রুজু করেন। রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ এগুলির অংশ দাবী করেন। রামমোহন এ দাবী অগ্রাহ্য করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহনের পিতা নিজেই ছেলেদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ কিছুদিন পরে মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলেন। ইহা ছাড়াও আরো কতকগুলি মামলায় তিনি এ সময়ে জড়িত হইয়া পড়েন। আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধতা তাঁহাকে কম সহিতে হয় নাই।

রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় তাঁহার বিরুদ্ধ দল যাহাতে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। রামমোহনকে সবদিক্ দিয়া 'একঘরে' করিবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের পাশের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ চারি পাঁচ হাজার লোকের দলপতি ছিলেন। তাহার লোকেরা রামমোহনের বাড়ীর নিকটে আসিয়া অতি প্রত্যূষে মুরগীর ডাক ডাকিত, অন্দরে গরুর হাড় ফেলিয়া দিত। রামমোহন এই সকল উৎপাত ধৈর্য ধরিয়া সহ্য করিতেন।

রামমোহন কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী রঘুনাথপুরে এক নূতন বাড়ী নির্মাণ করিলেন। রংপুর হইতে কর্মত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তিনি এই বাটিতে কিছু দিন বাস করিতেন। এই বাড়ির সম্মুখে একটি মঞ্চ নির্মাণ করিয়া উহার পার্শ্বদেশে তিনটি বৈদিক বাণী খোদিত করিয়াছিলেন—ওম্, তৎসৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই মঞ্চে তিনি প্রত্যহ তিনবার উপাসনা করিতেন। কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া এবং বাড়ী হইতে

কলিকাতা যাওয়ার সময় তিনি এই মঞ্চটি প্রথমে প্রদক্ষিণ করিতেন।

রামমোহনের বিপক্ষীয় দল ছড়া গাইত—

সুরাই মেলের কুল
(বেটার) বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল।
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা
বানিয়েছে স্কুল।
ও সে জেতের দফা
করলে রফা, মজালে তিন কুল॥

ছেলেরা দল বাঁধিয়া রাজাকে ক্ষ্যাপাইত। কলিকাতায় থাকিতে তিনি যখন ব্রহ্মসভায় উপাসনা করিতে যাইতেন, লোকে তাঁহার গাড়ীতে ঢিল ছুঁড়িত। এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে হইত।

এক সময়ে তাঁহার বিরোধী দল রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছিল। এমন দিনও গিয়াছে, যখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য আততায়ী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে। সেই সময়ে রামমোহন একাকী একমাত্র কিরিচ সম্বল করিয়া পথ চলিতেন। অনেক সময় তিনি পিস্তলও সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। রামমোহন অত্যন্ত সাহসী ও সতর্ক ছিলেন। গৃহে এবং বাহিরে রামমোহনকে কী যে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে, ভাবিলে তাঁহার বিশাল মনুষ্যত্বের নিকট মাথা আপনি নতি স্বীকার করে। এই যে এত নির্যাতন, উৎপীড়ন, সংগ্রাম-সংঘর্ষ ও বাধা-বিপত্তির মধ্যদিয়া রামমোহন জীবনখানি বাহিয়া চলিয়াছেন, ইহার বিরুদ্ধে তিান কোন-দিন কাহারো কাছে অভিযোগ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। তাঁহার কোন লেখাতে তিনি অন্তরের এই দ্বন্দ্বের পরিচয় দেন নাই।

নির্বিকার চিত্তে সব-কিছুই সহিয়াছেন। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। মাতা-পিতা যাঁহাকে বারবার ত্যাগ করিয়াছেন, নিজের পত্নীরা পর্যন্ত যাঁহার জীবন-সংগ্রাম হইতে দূরে রহিয়াছেন, সমাজ যাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই, দেশ যাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে, সেই মহাপুরুষ সেই স্বজন-পরিজন, সমাজ ও দেশবাসীর জন্য কি না করিয়াছেন। "শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? সমাজের যে-কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালে নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

"এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভরেতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এক প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তাঁর মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে।"

কলিকাতায় আগমন—জীবন-ব্রত উদ্যাপন

১৮১৪ সালে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বছর। কলিকাতা আগমন রামমোহনের জীবন-ইতিহাসে একটী বিশেষ ঘটনা। এক্ষণে বিষয়-কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রামমোহন একান্ত ভাবে তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হইলেন। দশ বছর সরকারী কাজ করিয়া তিনি যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা দেশের উন্নতির জন্য

ব্যথিত হইতে লাগিল। রামমোহন এখন হইতে সমস্ত সময়, শক্তি ও অর্থ পরম উৎসাহে একান্তভাবে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে নিয়োগ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—সর্বক্ষণ এই কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮১৪ সাল হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই ষোল বছর তাঁহার জীবনের কর্মযুগ বলা যাইতে পারে। এই ষোল বছর রামমোহন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার সকল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্রাম ছিল না। অক্লান্ত ভাবে দিনের পর দিন তিনি ঝড়ের বেগে কর্ম-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এক একটি বছর অতিক্রম হইত, রামমোহনেরও কর্মপ্রবাহ বাড়িয়া চলিত। কত যে কাজ, কত যে ভাবনা তিনি এই কয় বছরে করিয়া গিয়াছেন তাহার বিশালতা ও বিচিত্রতার কথা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়, শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে।

তাঁহার কাজের কথাগুলি বলিবার পূর্বে গোটাকয়েক কথা বলিয়া লইব। রামমোহন যখন কলিকাতায় আসিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার-সাধনে মনোযোগী হইলেন, সেই সময়ে গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ খড়্গ-হস্ত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তিনি মুষ্টিমেয় একদল লোকের বন্ধুত্বও লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা একটু বলা আবশ্যক। রামমোহনের জীবন-সংগ্রামে ইঁহারা তাঁহাকে অনেকটা সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহারা পারস্য ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে ইঁহাদের আস্থাও বিশেষ ছিল না। এইরূপ নিরবলম্ব অবস্থায় ইঁহারা রামমোহনের পতাকাতলে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর, কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, বৃন্দাবন মিত্র (ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঠাকুরদাদা), কাশীনাথ মল্লিক, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলিনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বানার্জি এবং বৈদ্যনাথ বানার্জি

উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণ বসুর পিতা), রাজনারায়ণ সেন, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতিও তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায় মাণিকতলায় থাকিতেন। মাণিকতলায় লোয়ার সার্কুলার রোডে তিনি এই বাড়ীখানি কিনিয়া উহা ইংরাজী ফ্যাসানে সজ্জিত করিয়াছিলেন। রামমোহন কলিকাতার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহার এই বাড়ীতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইত। বিদেশ হইতে কেহ এ দেশ ভ্রমণে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইত। ইহা ছাড়াও রামমোহনের কলিকাতায় আরও বাড়ী ছিল। মাণিকতলার এই বাড়ী হইতেই রামমোহন জীবনের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

আত্মীয় সভা

রামমোহন নিজের মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'আত্মীয় সভার' প্রতিষ্ঠা একটি। যে-বছর তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন, তাঁহার পর বৎসরই আত্মীয়-সভা স্থাপিত হইল (১৮১৫)। উহা প্রথমে তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সর্বশেষে বড় বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। আত্মীয় সভা সপ্তাহে একদিন করিয়া হইত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বেদান্তানুযায়ী এক ব্রহ্মের উপাসনা এবং পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকা। এই সভায় সর্বপ্রথম রামমোহনের পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন। তারপর বেতন-ভোগী গায়ক গোবিন্দ

মাল রামমোহনের রচিত একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইতেন। এই সভায় সকলে প্রবেশ করিতে পারিত না। শুধু রামমোহনের কয়েক জন বন্ধু ইহাতে যোগদান করিতেন।

কিন্তু এই সময়ে আত্মীয় সভার বিরুদ্ধে চারিদিকে তীব্র নিন্দা প্রচার হইতেছিল। এমন সব মিথ্যা অপবাদ রটিতে লাগিল যে আত্মীয় সভায় গো-বধ করা হয়। ফলে, রামমোহনের অনেক বন্ধু তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। কিন্তু রামমোহন দমিবার লোক ছিলেন না। অদম্য তাঁহার কর্মশক্তি ছিল, অফুরন্ত ছিল তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা।

আত্মীয় সভা যখন বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ১৮১৯ সালে উক্ত বাটীতে মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের এক শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। ইহাতে হিন্দুসমাজে খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে এই সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমা পূজা এই তর্কের বিষয় ছিল। রামমোহন এই তর্ক-সভায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনিই ইহাতে জয় লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পর রামমোহনের বিরুদ্ধে নূতন বিপদ্ উপস্থিত হইল। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে মামলা উপস্থিত করিলেন। দুই বছর এই মামলার জন্য রামমোহনকে বড়ই বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তদুপরি বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গেও এক মোকদ্দমা চলিয়াছিল। এই সকল কারণে আত্মীয় সভা দুই বছর বন্ধ ছিল। বিশেষতঃ রামমোহন এই সময় হইতে তাঁহার বন্ধু অ্যাডাম সাহেবের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ইউনিটেরিয়ান ভজনালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও ব্যস্ত ছিলেন।

এইরূপে কলিকাতায় একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই রামমোহন পূর্ণ উদ্যমে তাঁহার প্রচার কার্য চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হিন্দুশাস্ত্র প্রচার

রামমোহনের জীবন কর্মবহুল হইলেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি সর্বোপরি বিশেষ ভাবে একজন ধর্ম-সংস্কারক। রামমোহনের ধর্মমত কি ছিল তাহা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব। এক কথায় বলিতে গেলে বলিব, রামমোহন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী ছিলেন এবং শাঙ্করবাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে শাঙ্করবাদের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধও ছিল যথেষ্ট এবং তাঁহাকে কোন মতবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। সেকালের প্রচলিত বহুদেববাদ-সমাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এই জন্যই সর্বপ্রথমে রামমোহন ব্রহ্মবাদ-প্রতিপাদক উপনিষদাদি বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্র গ্রন্থ-প্রচারে রামমোহনের "পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্রদ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ।" বিশেষতঃ এই সময়ে দেশে স্বাধীন চিন্তা বা বিচার-বিতর্কের উন্মেষ হয় নাই, সকলে শাস্ত্রকেই যুক্তি-তর্কের অতীত বলিয়া প্রামাণ্য মনে করিত। রামমোহন সেই যুগেরই মানুষ। যদিও তাঁহার নিজের জীবনে একটা যুক্তিবাদের (Rationalism) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তথাপি পারিপার্শ্বিকের এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া শাস্ত্রকেই স্বতঃ-প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল, কেননা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ যুক্তি কেহ গ্রাহ্য করিত না।

১৮১৫ সালে রামমোহনের "সকল বিচারের ভিত্তিস্বরূপ" সর্বপ্রথম বেদান্ত গ্রন্থ বা বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহার পর বৎসর ইহার হিন্দুস্থানি (উর্দ্দু) ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে বাংলা গদ্যের শৈশবকাল। উনবিংশতি শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যরচনা বিশেষ কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। ১৮০১ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এইখানে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের বাংলা শিখাইবার জন্য ঐ কলেজের কয়েকজন পণ্ডিত খানকতক বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উহা একেবারে সংস্কৃত-ঘেষা—সন্ধি-সমাস-বিবর্জিত সংস্কৃত বই বলিলেই চলে। রামমোহনের পূর্বে ইহাই ছিল একমাত্র বাংলা গদ্য রচনা। লোকে এতদিন পদ্য রচনার সঙ্গেই অভ্যস্ত ছিল। গদ্য কি করিয়া পড়িতে হয় তাহাও লোকে জানিত না। রামমোহন এই সংস্কৃত-বহুল বাংলাকে সরল ও সহজ করিলেন। লোকে যাহাতে গদ্য পড়িতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার প্রথম বাংলা গ্রন্থ বেদান্তসূত্রে গদ্য পঠনের একটী নিয়ম লিখিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, সে কালে বাংলায় বিরাম-চিহ্ন কমা বা সেমিকোলনেরও প্রবর্তন হয় নাই।

রামমোহনের এই বেদান্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"তিনি (রামমোহন) তাহার (বেদান্তের) যে প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা যদিও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি বেদান্তের সমুদায় সার তাৎপর্যই তদ্দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে কিছুতেই ঐরূপ ভাষ্য করা যায় না। তিনি যে সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বিচারতঃ তাঁহাকে একজন হিন্দুশাস্ত্রীয় দর্শনকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"

১৮১৬ সালে রামমোহন কেন এবং ঈশ উপনিষদ প্রকাশ করেন এবং ১৮১৭ সালে কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ প্রকাশিত হয়। শেষোক্তখানি ছাড়া ইহার সকলগুলিই তিনি ইংরাজীতে অনূদিত করিয়াছিলেন। সবগুলি উপনিষদ্‌ই ভাষ্য ও ভূমিকা সহিত ছাপা হইয়াছিল। তখন দাম দিয়া বই কেনার মত মনোবৃত্তি লোকের ছিল না। রামমোহন বিনামূল্যে ইহা বিতরণ করিয়াছিলেন। অনেক বই একাধিক বারও ছাপাইয়া বিলি করিয়াছেন।

"বেদান্তসূত্র অতি বিস্তৃত ও কঠিন গ্রন্থ। যদিও রামমোহন রায় স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে সংক্ষেপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছেন; কিন্তু ততখানিও অধ্যয়ন করা এবং তাহার মর্ম ও মীমাংসা অবধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল না। এজন্য তিনি উহার তাৎপর্য সার সঙ্কলন পূর্বক বেদান্তসার নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।"

১৮১৬ সালে ইহার ইংরেজী অনুবাদে খ্রীস্টীয় পাদরীগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রামমোহনের পরিচয় য়ুরোপে প্রচার করিয়াছিলেন।

রামমোহনের পূর্বে বাংলার পণ্ডিতেরা ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বেদ-উপনিষদের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। এমন কি অনেকে মনে করিত, উহা রামমোহনের নিজের তৈরী জাল গ্রন্থ। বাংলাদেশে বেদ ও বেদান্তের চর্চা রামমোহন এযুগে প্রবর্তন করিলেন। ইহা বাংলার জাতীয় জীবনে তাঁহার মস্ত বড় দান।

যে বেদ শূদ্রে উচ্চারণ করিলে জিহ্বা কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহাই রামমোহন আপামর সর্ব্বসাধারণে ছড়াইয়া দিলেন। হিন্দু সমাজে বিষম চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নির্যাতন রামমোহনের উপরও প্রবল বেগে পতিত হইল। সেই কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহন তাঁহার ইংরাজী বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও

সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণেরও তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন অধিক হউক না, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিবেন, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অন্ততঃ এই সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে, আমার আন্তরিক অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্য, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।"

রামমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

বিচার ও বিতর্ক

এই সকল গ্রন্থ প্রকাশের ফলে রামমোহনের খ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি এই সময়ে ইংলণ্ড, ফরাসীদেশ এবং আমেরিকাতেও রামমোহন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার ফলে চারিদিক্ হইতে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

১৮১৩ সালে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রধান ইংরেজী শিক্ষক শঙ্কর শাস্ত্রী নামক এক পণ্ডিত 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়ার' (Madras Courier) পত্রিকায় রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রতিমাপূজার সমর্থন করিয়া এক চিঠি প্রকাশ করেন। উহার উত্তরে রামমোহন 'A Defence of Hinduism' (হিন্দুধর্মের সমর্থন) নামে একখানি প্রতিবাদ পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। ইহার মধ্যে শঙ্কর শাস্ত্রীর চিঠিখানিও পুনঃমুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই কলিকাতা গবর্নমেণ্ট কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া রামমোহনের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইলেন। উভয় পক্ষের মতামত বাঙ্গালা এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই মুদ্রিত হইয়াছিল। রামমোহনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা।' 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে রামমোহন ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার, রামমোহনকে অতি কদর্য বিদ্রূপ ও দুর্বাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে রামমোহন যে উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা রামমোহনের উপযুক্ত। রাজা লিখিয়াছিলেন—"আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু এবং দুর্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়; দ্বিতীয়ঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে, দুর্বাক্য কথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই।"

ইহার পর এক গোস্বামী রামমোহনের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন। ১৮১৮ সালে ২রা শ্রাবণ রামমোহন 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নামে এক প্রতিবাদ-পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

ইহার পর এক কবিতাকারের পুস্তিকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া রামমোহন এক পুস্তিকা রচনা করেন (১৮২০ সাল)।

কলিকাতা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নাম গ্রহণ করিয়া রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন করেন। রামমোহন উহার উত্তরে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮২২ সালে উহা ছাপা হয়। ইহা প্রকাশিত হইলে তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'পাষণ্ড-পীড়ন' নামে আর এক গ্রন্থ ছাপিয়া রামমোহনের পাল্টা জবাব দেন। ইহাতে রামমোহনকে 'পাষণ্ড' এই নামে গালি দেওয়া হইয়াছে। রামমোহন ইহার উত্তরে 'পথ্য প্রদান' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখেন।

একদিকে রামমোহন পুস্তক লিখিয়া লিখিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা তর্কসভায় বড় বড় পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারদ্বারাও তাঁহার মত প্রচারিত হইতেছিল। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের বিচারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৮১৯ সালে বাগবাজারে চৌবের বাড়ীতে আত্মীয় সভায় এই বিচার হইয়াছিল এবং রাজা রাধাকান্তদেব গোঁড়া হিন্দু-পক্ষীয়দিগের পৃষ্ঠপোষকরূপে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে সহরে একটা বিষম তোলপাড় সৃষ্টি হইয়াছিল। রামমোহন এই বিচার-কথা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ছাপিয়াছিলেন।

রামমোহনের "এই সকল বিচারগ্রন্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায় পূর্বোক্ত বেদান্তসূত্র এবং উপনিষদ্ সকলের সহযোগে এক এক ভূমিকা দিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ঔচিত্য এবং রামমোহন রায়ের ও তাঁহার অনুবর্তিগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা, বেদবিচারের অক্ষমতা, এবং বিবিধ ব্যবহার-দোষ প্রদর্শন করিয়া এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় ঐ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উল্লিখিত উত্তর গ্রন্থসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচারগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচারগ্রন্থের মর্ম পাওয়া যায়।"

এই সকল তর্ক-বিতর্কে—কি লেখায় কি আলোচনায় রামমোহনের চির গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য কখনও বিচলিত হইত না। লোকের কটু-কাটব্যে বা নিন্দা-কুৎসায় তিনি কখনও উত্তেজিত হইতেন না। রামমোহনের আর একটি বিশেষত্ব ছিল; তিনি

কথনও বাজে বকিতেন না—যতটুকু লেখা আবশ্যক বা বলা আবশ্যক শুধু তাহাই বলিতেন। রামমোহন বলিতেন—'ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।" আমার নিজের জয় চাই না, সত্যের জয় হউক—ইহাই তাঁহার জীবনের সকল কর্মের মূল মন্ত্র ছিল।

খৃষ্টীয় পাদ্রীদের বিরুদ্ধে অভিযান

১৮২০ সালে দেশবাসী অবাক্ হইয়া দেখিল, রামমোহন 'যীশু খৃস্টের উপদেশ—শান্তি সুখের পথ' (Precepts of Jesus—Guide to Peace and Happiness) এই নামে এক নূতন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশ রামমোহনের পক্ষে অত্যন্ত সাহসের কাজ হইয়াছিল। একথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সে সময়ের হিন্দু সাধারণের মনোভাবের কিছুটা পরিচয় জানা আবশ্যক। সেকালে হিন্দুগণ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন। এমন কি সাহেবদের সহিত সর্ব প্রকার সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতেন। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ স্কট্‌লণ্ডীয় মিশনারী ডাঃ ডাফ যখন কলিকাতায় প্রথম তাঁহার মিশনারী স্কুল খুলিলেন, তখন কেহ তাঁহার স্কুলে ছাত্র দিল না। অথচ ইংরেজী শিক্ষার জন্য সকলেই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। সেই সময়ে রামমোহনের মত প্রতিপত্তিশালী লোককে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াও মাত্র ছয়টি ছেলে পাইতে হইয়াছিল। ইহাদিগকে লইয়াই ডাফ সাহেবের স্কুল আরম্ভ হইয়াছিল। এমনি বিরুদ্ধ ভাব ছিল খ্রীষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে। রামমোহন কিন্তু উদারতা-প্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে ভুল বুঝিল। রামমোহনের উপর তাহাদের বিদ্বেষ বরং বাড়িল।

ওদিকে যাহাদের প্রভুর উপদেশ রামমোহন ছাপিলেন, তাহারাও তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাহাদের ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইহার কারণ, রামমোহন যীশুর উপদেশসমূহ মান্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক বৃত্তান্তগুলি একেবারে বাদ দিয়া দিয়াছেন। গোঁড়া খৃষ্টীয়ানদের ইহা সহ্য হইবে কেন?

মার্শম্যান সাহেবের প্রতিবাদের উত্তরে রামমোহন "সত্যের বন্ধু' (A Friend to Truth) নাম লইয়া An Appeal to the Christian Public (খৃষ্টীয় লোকের প্রতি নিবেদন) নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন (১৮২০ সাল)। মার্শম্যান সাহেব সহজে নিরস্ত হইলেন না। তিনি আবার লিখিলেন। রামমোহন তাহার উত্তরে Second Appeal to the Christian Public (খৃষ্টীয় জনসাধারণের প্রতি দ্বিতীয় নিবেদন) নামে আর এক পুস্তিকা ছাপিলেন। মার্শম্যান সাহেব আবার লিখিলেন। রামমোহন তাহার তৃতীয় উত্তর লিখিলেন। কিন্তু ইহার ছাপা লইয়া গোল বাঁধিল। এতদিন ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেস রামমোহনের বই ছাপাইয়া আসিয়াছে। এখন তাহারা ছাপিতে নারাজ হইল। কোন বিপদ্‌ই রামমোহনকে কাবু করিতে পারিত না। এবারও পারিল না। তিনি নিজে এক প্রেস দিয়া বসিলেন। তাহার নাম দিলেন ইউনিটেরিয়ান প্রেস। এখান হইতে ১৮২৩ সালে তাঁহার Final Appeal (শেষ নিবেদন) ছাপা হইল। এই পুস্তকে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। এই সকল আলোচনার সময় রামমোহন ইংরাজীতে অনূদিত বাইবেলের জ্ঞানে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মূল বাইবেল জানিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষা শিখিলেন। মূল হিব্রু বাইবেল হইতে দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেখাইলেন, মার্শম্যান সাহেবের ভুল কোথায়। ইহার পর

মার্শম্যান নীরব হইয়া গেলেন। কলিকাতায় এক য়িহুদীর নিকট নাকি ছয় মাসে রামমোহন হিব্রু শিখিয়াছিলেন। এই সকল বিচার-বিতর্ক সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' ইংরেজ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, 'এই বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে রামমোহন রায় এদেশে এখনও তাঁহার সমতুল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই।' রামমোহনের এই সকল গ্রন্থ তাঁহার জীবদ্দশাতেই লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলে য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে খ্রীষ্টীয় সমাজে বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উইলিয়াম অ্যাডাম নামে একজন যুবক ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনারী শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করিবার জন্য বিলাত হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অ্যাডাম সাহেবের মত পরিবর্তন ঘটিল। ত্রিত্ববাদী গোঁড়া ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের ত্যাগ করিয়া ১৮২১ সালে তিনি একত্ববাদী (Unitarian) হইলেন। কলিকাতার খৃষ্টীয়ানগণ তাহাকে Second Fallen Adam বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অ্যাডাম সাহেবের এই মত-পরিবর্তন কিরূপে হইল তাহাই বলিতেছি। রামমোহন, অ্যাডাম সাহেব ও ইয়েট্‌স্ (Mr. Yates) সাহেবের সাহায্যে যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচার পুস্তক চতুষ্টয় বাংলায় তর্জামা করিতেছিলেন। সেই সময়ে অনুবাদ লইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্মমত সম্বন্ধে প্রায়শই নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিত। মতদ্বৈধের ফলে ইয়েট্‌স্ সাহেব এই সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। অ্যাডাম সাহেব রামমোহনের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না, নিজের মত ত্যাগ করিলেন।

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। তাহাদের পরিচালিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং বাংলা পত্রিকা 'সমাচার-দর্পণ' রামমোহনকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিল। রামমোহনও সুদক্ষ যোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। তিনি জবাব

লিখিয়া পাদ্রীদের কাগজে পাঠাইলেন। তাহারা উহা ছাপিলেন না। পত্রিকা-সম্পাদকের সাধারণ ভদ্ররীতিও এইরূপে উপেক্ষিত হইল।

রামমোহন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নিজেই 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। উহাতে নিজের মতসমূহ প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিকে শ্রীরামপুরের মিশনরীরা যেমন রামমোহনের বিরুদ্ধে লাগিলেন, কলিকাতাতে টাইটলর নামে এক সাহেবও তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধে কলম চালাইতে লাগিলেন (১৮২৩ সাল)। রামমোহন রামদাস নামে সাহেবের উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। রামমোহনের এক গুণ ছিল—তিনি ব্যঙ্গ করিয়া গোঁড়া খ্রীষ্টীয়দের বিরুদ্ধে লিখিতেন। ইহাতে প্রতিপক্ষ ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু জবাব দিবার কিছু পাইত না। 'একপাদ্রী ও তাহার চীনদেশীয় তিন শিষ্য সংবাদ' এইরূপ একটি চমৎকার উপভোগ্য ব্যঙ্গ-রচনা।

১৮২১ সালে 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' প্রকাশিত হইল। রামমোহন কেন পাদ্রীদের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা প্রচার করিলেন সে কথা তিনি এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই লিখিয়াছিলেন।

"শতার্ধ বৎসর হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসর তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট

প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্য্য ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগকে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।"

উপরের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে সময়ে খ্রীষ্টান পাদরীগণ দেশের লোককে খ্রীষ্টান করিবার জন্য সকল উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া পূর্ণ বেগে প্রচার-কার্য চালাইতেছিল, তাহারই মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল রাজা রামমোহন। তাঁহার মত শক্তিশালী পুরুষ এই বন্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম আন্দোলন এই খ্রীষ্টীয় আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে যথেষ্ট সহয়তা করিয়াছে। রামমোহনের এই অসাধারণ কার্যের কথা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"কি সঙ্কটের সময়েই তিনি (রামমোহন) জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খ্রীষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।"

ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভা

রামমোহন কলিকাতা আসিয়া আত্মীয় সভা স্থাপন করেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮১৯ সাল পর্যন্ত আত্মীয় সভা বাঁচিয়া ছিল। তারপর বন্ধ হইয়া যায় দুই কারণে। প্রথম কারণ, রামমোহনের বৈষয়িক মোকদ্দমা। একথা পূর্বে লিখিয়াছি। দ্বিতীয় কারণটি উল্লেখযোগ্য। অ্যাডাম সাহেব ধর্মমত পরিবর্তন করিয়া 'হরকরা' নামক পত্রিকার আফিসের দোতালায় 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে একত্ব-বাদী খ্রীষ্টান মতানুযায়ী উপাসনা হইত। রামমোহন ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী ইহাতে যোগদান করিতেন। কিন্তু অ্যাডাম সাহেবের এই সভা বেশী দিন টিকিল না। ১৮২৪ সালের প্রথম দিকে ইহার সভ্যসংখ্যা এত কমিয়া গেল যে এই সভা আর কোন রকমেই বাঁচাইয়া রাখা চলে না। এই সময়টায় ব্রহ্ম-সভা স্থাপনের সঙ্কল্প রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুদের মনে জাগিয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিতেছি। একদিন রামমোহন অ্যাডাম সাহেবের সভা হইতে ফিরিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তদীয় শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। তাঁহারা রামমোহনকে বলিলেন,—বিদেশীয়দিগের উপাসনা-স্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কথাটা রামমোহনের মনে লাগিল। এবিষয়ে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকিনিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে তাঁহার বাড়ীতে এই নিমিত্ত এক পরামর্শ "সভা

হইল। সেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং হাবড়া-নিবাসী মথুরানাথ মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই মহৎ কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিলেন।

ইহার পর শীঘ্রই এই উদ্দেশ্যে চীৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। ১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র উপাসনা-সভা স্থাপিত হইল।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সভার কার্য হইত। প্রথমে দুইজন তেলেগু বা হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন। পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলায় বৈদিক ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপর যন্ত্রসহযোগে সঙ্গীত হইলে সভা ভঙ্গ হইত। সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী এবং তবলা বাজাইতেন গোলাম আব্বাস। বিষ্ণু অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৬০ জন লোক উপস্থিত হইতেন। সকলেই ভাল পোষাক পরিয়া আসিতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী সর্বপ্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে চিৎপুর রোডের পার্শ্বেই এক খণ্ড জায়গা কিনিয়া বর্তমান সমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) এই নূতন গৃহে সভার কার্য আরম্ভ হইল। এখনও এই দিনই ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম কিছুদিন ভাদ্র মাসে বাৎসরিক উৎসব হইত। এই উপলক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী ও মথুরানাথ মল্লিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে প্রচুর ধনদান করিতেন। এই সভা তখনও ব্রাহ্ম সমাজ নাম ধারণ করে নাই। ইহা সেকালে ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজ নামে পরিচিত ছিল।

এই ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামমোহনের যথার্থ মনোভাব কি তাহা জানা আবশ্যক। ইহার ন্যাসপত্র (Trust Deed)

রামমোহন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে তাঁহার মত জানা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober religious and devout manner…

For the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but no under or by any other name, designation or titl used for and applied to any particular being o beings by any man or set of men whatsoever.

"এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, কোন প্রকার পার্থক্য ন করিয়া যে কোন লোক যথোচিত ভদ্র ও শান্ত ভাবে, ধর্মভাবে এব ভক্তির সহিত এখানে মিলিত হইয়া সকল প্রকার সভা সমি করিতে পারিবে।

"সেই শাশ্বত অচিন্তনীয় ও অব্যক্ত পরম পুরুষের উপাসনা সম্পূজনের জন্য—যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা—তাহার জন্য এই উপাসনা-আলয়। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে অন্য কোন কিছুর উপাসনা এখানে হইতে পারিবে না।

"ইহার উপাসনাতে কোন প্রকার ছবি, প্রতিমূর্তি ব্যবহৃত হই না। নৈবেদ্য, বলিদান, প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হই না। কোন প্রাণী হিংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার প হইবে না। যে কোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদা উপাস্য, এখানকার বক্তৃতা বা সংগীতে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণ সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অভাব পক্ষে ভাব পক্ষে এই যে, যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ

ধারণার উন্নতি হয়; প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।"

ব্রহ্মসভা ও বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ, রামমোহনের ধর্মমত ও পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মমত—ইহাতে পার্থক্য ও সামঞ্জস্য কোথায় এবং কেন, তাহা পরে আলোচনা করিব। এখানে একটা বিষয় বলা আবশ্যক। তাহা ধর্মসভার কথা। ধর্মসভার আন্দোলন ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধ আন্দোলন। ধর্মসভা গোঁড়া হিন্দু সমাজের (Conservative) মুখপাত্র, ব্রাহ্মসভা উন্নতিশীল ও উদারমতাবলম্বী হিন্দু-সমাজের (Progressive & Liberal) মিলন-ক্ষেত্র। এই দুই দলে তখন যে প্রবল ঝগড়া-বিবাদ চলিতেছিল, তাহা সেকালের পুঁথি-পত্রাদিতে সাক্ষী রহিয়াছে।

ব্রহ্মসভা যেদিন নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল, তাহার ছয়দিন পূর্বে ধর্মসভা মহাধূমধামের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ইহার উদ্বোধন-দিবসে সভা-গৃহের এক মাইল দূর পর্যন্ত সারি সারি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, এই সভা তখন হিন্দু সমাজকে কিরূপ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভায় ভীষণ আড়াআড়ি চলিত। নদীর ঘাটে, বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে, হাটে-বাজারে, পথে সর্বত্র এই দুই দলের বিষয়ে আলোচনা লোকের মুখে মুখে ভাসিয়া বেড়াইত। আবার সংবাদ-পত্রে দুই দলের বাদ-প্রতিবাদ চলিত। ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অকথ্য ও তীব্র নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল। রামমোহনের সাপ্তাহিক 'সংবাদ-কৌমুদী'তে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ধর্মসভার প্রচুর অর্থবল, উহার প্রচারকগণ ঘরে ঘরে যাইয়া রামমোহনের কুৎসা রটাইতে লাগিল। যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসভার

উৎসবে পারিতোষিক গ্রহণ করিতেন, তাহারা হিন্দুসমাজে নিগৃহীত হইলেন। কিন্তু সবচেয়ে নির্যাতন ভোগ করিতে হইল রামমোহন নিজেকে। বিশেষতঃ এই সময়ে রামমোহনের ক্রমাগত অক্লান্ত ও অবিচলিত চেষ্টার ফলে সতীদাহ বন্ধ করিবার জন্য বেন্টিঙ্কের গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে ধর্ম্মসভা একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। উহার তীব্রতা আসিয়া পড়িল রামমোহনের উপর। রামমোহনের নিন্দা-কুৎসার অবধি ছিল না, কত ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহাকে উপহাস ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহার জীবন পর্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। দুইবার নাকি তাঁহাকে হত্যা করিবার বিফল প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"সে সময়ে ধর্ম্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন; কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গম্ভীর ভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন—কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন। এই একটী তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।"

অনেকে বলিবেন, রামমোহন যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন তাহাতে নূতনত্ব কি আছে? অনেকে লিখিয়াছেন, *সার্বভৌমিক উপাসনা প্রচার এইটিই তাঁহার নূতন।* একথার উত্তরে আমরা বলিব, নূতন কে কি বলিল কিংবা করিল তাহা অনেক সময়ই তর্কের বিষয়ীভূত। কিন্তু একথা জোর গলায় বলিব, নূতনই হোক বা পুরাতনই হোক, রামমোহন সেদিন যাহা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এই জন্যই উহার মূল্যও আছে।

এইরূপে তুমুল বাত্যা-বিক্ষোভের মধ্যে রামমোহনের আকৈশোরের স্বপ্ন ও সঙ্কল্প রূপ পরিগ্রহ করিল। ইহারই জন্য বছরের পর বছর কত আবেগ ও উদ্বেগ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন। নব্য ভারতের ধর্ম্ম-ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনে ইহা এক স্মরণীয় শুভদিন—নবযুগের পুণ্যাহ। আজ একথা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা হয়ত আমাদের পক্ষে কঠিন হইতে পারে। আজ ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অবস্থিতির প্রয়োজন তর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু সেদিন ব্রহ্মসমাজের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে ছিল। ধর্ম শব্দের অর্থ যদি ইহাই হয় যে যাহা মানবসমাজকে ধারণ করিয়া বা বাঁচাইয়া রাখে তাহাই ধর্ম, তবে বলিব, ব্রাহ্মসমাজ বা ধর্ম সেদিন হিন্দুজাতিকে, হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিল। উহার জীবনে সেদিন ইহাই ছিল পরম সার্থকতা। ইহারই ফলে পরবর্ত্তী কালে হিন্দু ধর্মের জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের যে মহা-অভ্যুদয়ের জয়-যাত্রা সেই যে অর্ধশতাব্দী যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও প্রেরণা যোগাইয়াছিল এই মুক্তিকামীর দল—যাঁহারা রামমোহনের নেতৃত্বে তৎকালীন হিন্দুসমাজের প্রচলিত স্থবির গতানুগতিক নিয়ম-নিগড় ভাঙিয়া দীপ্তোজ্জ্বল ও সর্ববন্ধনমুক্ত এক মহাজীবনের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন।

রামমোহনের ধর্মমত—ধর্ম-সমন্বয়

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্মমত লইয়া বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে যথেষ্ট। 'তুহফাতুল মওয়াহিদীন' নামক গ্রন্থে তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপে যুক্তিবাদের (Rationalism) যুগ। উহার ফলে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা, সংস্কার ও বিশ্বাস সব-কিছু ভাঙিয়া পড়িতেছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এই মত রামমোহনকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদীনে' তাহারই আভাস। কিন্তু ইহার পরবর্তী কালে রামমোহন যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন বা বিচার করিয়াছেন সর্বত্রই শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার কারণ কি? ব্যক্তিগত ভাবে রামমোহন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত পুরুষ ছিলেন। কোন ধর্মশাস্ত্রকেই তিনি অপৌরুষেয় বা অভ্রান্ত বলিয়া মানিতেন না। তবে প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রেই পূর্বযুগ-সঞ্চিত কতকগুলি সত্য নিহিত আছে, ইহা রামমোহন বিশ্বাস করিতেন এবং এই ভাবেই প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। রামমোহন যখন যাহার সহিত বিচার-বিতর্ক করিতেন, তখন তাহার ধর্মশাস্ত্র হইতেই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লইয়া প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতেন। মুসলমানের সঙ্গে যখন তর্ক করিতেন, তখন কোরাণ প্রামাণ্য ধরিয়া লইয়া তর্ক করিতেন, খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে তর্ক করিবার সময় বাইবেল হইতে দৃষ্টান্ত লইতেন, হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কের সময় হিন্দুশাস্ত্র প্রামাণ্য স্বীকার

করিয়া আলোচনা করিতেন। এই জন্যই মুসলমানগণ তাঁহাকে বলিত জবরদস্ত মৌলভী, আবার ক্রিশ্চানগণের নিকট ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চান বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। রামমোহন জানিতেন, যাঁহাদের সহিত তাঁহার বিচার-আলোচনা করিতে হয়, তাঁহারা তাঁহার শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি ধারণা করিতে পারিবে না। কাজেই তিনি যখন যে সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে ধর্মবিচার করিয়াছেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের অবলম্বিত শাস্ত্রদ্বারাই নিজ মত স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

রামমোহন তাঁহার জীবনে এবং ব্যবহারে পুরাদস্তুর হিন্দু ছিলেন। হিন্দু সমাজে, হিন্দুভাবে এবং হিন্দুয়ানি অনুসারে তিনি আমরণ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি কোন দিন নিজেকে অহিন্দু বলেন নাই। বরং তিনি স্পষ্ট ভাবে ইহাই বলিয়াছেন—"আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।" মৃত্যু সময়েও তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন খ্রীষ্ট ধর্মানুযায়ী করা না হয়। তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ সশ্রদ্ধ ভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামমোহন প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ মনীষা-প্রভাবে ধর্মরাজ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। মোক্ষমূলর সাহেব বলেন, তুলনামূলক ধর্মালোচনা এযুগে রামমোহনই সর্বপ্রথমে প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মগুলির বিশেষ ভাবে আলোচনা রামমোহনই সর্বপ্রথম করিয়াছেন। উহারই ফলে একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মসভার পরিকল্পনা তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল। ব্রহ্মসভায় তাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ব্রহ্মসভা অসাম্প্রদায়িক ভাবে এক ব্রহ্মের উপাসনা স্থল। ইহা ধর্ম-সাধনার সামাজিক রূপ। এরূপ ব্যবস্থা হিন্দুসমাজে ছিল না।

ক্রীশ্চান ধর্মের প্রভাবে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রামমোহন ইহাকে হিন্দুরূপে রূপায়িত করিয়াছেন।

ব্রহ্মসভার ট্রাষ্ট-ডীড্ অনুসারে যে-কোন সম্প্রদায় বা ধর্মের বা সমাজের লোক এখানে উপাসনাদি করিতে পারিবে। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। রামমোহন এই ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের একটি সম্মিলিত উপাসনা-স্থল সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক অথচ উহারই অন্তর্বর্তী একটি আলাদা সমাজবিশেষের সৃষ্টির কথা বোধ হয় তাঁহার মনে জাগে নাই। হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ একটি সমাজ তিনি আদৌ ইচ্ছা করিতেন কিনা তাহাও তাঁহার গ্রন্থালোচনা করিলে নির্ণীত হয় না। উহা পরবর্তী সৃষ্টি।

ধর্মরাজ্যে এইরূপ একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনদ্বারা পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রামমোহন একটা একতা সংস্থাপনের প্রয়াস পান। এই দিক্ দিয়া হয়ত বা ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের চিন্তাও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এইরূপে রামমোহন তাঁহার অসাধারণ মনীষাদ্বারা বর্তমান ভারতে একটা সামঞ্জস্যের বাণী প্রচার করেন।

ইহার পূর্বেও সামঞ্জস্যের চেষ্টা এদেশের মধ্যযুগের সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণ করিয়া গিয়াছেন। নানক, কবীর, দাদু, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ এই সমন্বয়েরই বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া রামমোহন ইহাদেরই ভাবধারার সংবাহক। রামমোহনের সঙ্গে মধ্য যুগের সাধকগণের পার্থক্য এই যে, ইহারা শুধু হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মের মধ্যেই সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানও এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, য়িহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির আলোচনা করিয়া একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন। এই দিক্ দিয়া রামমোহনের সঙ্গে পরবর্তী

যুগের পরমহংস রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে একটা মিল দেখা যায়। উভয়েই বিভিন্ন ধর্ম-প্রণালীর চর্চা ও আলোচনা করিয়া সামঞ্জস্যের বাণীর প্রচারক। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, রামমোহন যাহা অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধি ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণে তাহাই সাধনের পথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একজনে জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রধান, অপরে ভাব বা ভক্তি প্রধান। এই সামঞ্জস্যের বাণী এযুগে রামমোহনের বিশেষ দান।

ধর্মের এই সামঞ্জস্য ও সার্বভৌমিকতা ব্যক্তিগত জীবনে কার্যকরী করিতে রামমোহন নির্ভর করিয়াছিলেন উপনিষদাদি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক এক-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হিন্দুশাস্ত্রের উপর। মূলতঃ কোন ধর্মমত বা ধর্মশাস্ত্র সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক নয়। উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। উহা বিশ্বজনীন এবং অসাম্প্রদায়িক। উহার দৃঢ় ভিত্তির উপর রামমোহন স্বীয় মত ও ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহনের জীবনের দুইটি দিক্—একটা বিশ্বজনীন এবং অপরটি জাতীয়। জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর রামমোহন এই সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একথা ভুলিলে চলিবে না যে রামমোহন সর্বোপরি হিন্দু-সংস্কারক ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে বেদান্তানুযায়ী ব্রহ্মবাদী বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রামমোহন অসাম্প্রদায়িক উপনিষদ্-উক্ত বিশুদ্ধ (সাম্প্রদায়িক ভাষা ও মতদ্বারা অকলুষিত) এক-ব্রহ্মবাদের প্রচার করেন, যদিও উপনিষদাদির অনুবাদ প্রচারে তিনি 'ভগবান্ ভাষ্যকারের' (শঙ্করাচার্যের) মতানুযায়ী ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেকে শাঙ্কর বৈদান্তিক বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মবাদমূলক উপনিষদাদি ব্যতীত ব্রহ্মোপাসনা, গায়ত্রীর অর্থ, প্রার্থনা-পত্র অনুষ্ঠান, গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং, ক্ষুদ্রপত্রী প্রভৃতি পুস্তিকা হিন্দুভাব, হিন্দু মত ও হিন্দু আদর্শের পরিচায়ক।

. রামমোহন কোন নূতন ধর্মমত প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তিনি তৎকাল-প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহুকালসঞ্চিত আবর্জনা দূর করিয়া উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ যুগোপযোগী রূপ দান করিয়া হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করেন। রামমোহন কোন নব ধর্মের প্রচারক নহেন, তিনি মানবধর্মের প্রচারক। ইহাই রামমোহনের গৌরবজনক আখ্যা, 'ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক' নহে।

সমাজ-সংস্কারক

ধর্মসংস্কারক রামমোহনের পরিচয় মোটামুটি দিয়াছি। এখন তাঁহার সমাজ-সংস্কারের কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি, নারী-জাতির উপর রামমোহনের শ্রদ্ধা ও দরদ ছিল। নারীর আর্তনাদ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে সব চেয়ে বেশী। সেকালে সতীদাহের মত অত-বড় নৃশংস ব্যাপার কিছু ছিল না। রামমোহন আমরণ ইহারই বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকালে নিজের চোখের সামনে একটি সহমরণ দেখিয়া উহার নৃশংসতা বালক রামমোহনের কোমল প্রাণে গভীর ক্ষত আঁকিয়া দিয়াছিল। ইহার পর হইতেই তিনি এই নৃশংস নারীহত্যার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

সে কালে সতীদাহ কি প্রকারে প্রচলিত ছিল এবং তাহা নিবারণের জন্য দেশের শাসনকর্তারা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। মৃতপতির সহিত সহমৃতা হওয়া এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই নাকি প্রচলিত ছিল। ধর্ম ও পুণ্যের নামে লোকে কতদূর নির্মম ও নিষ্ঠুর কাজ করিতে পারে

তাহার একটী নিদর্শন সতীদাহ। রামমোহনের সমকালে ইহাতে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা চরমে পৌঁছিয়াছিল। ভাগীরথীর দুই তীর আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত চিতানলে বিধবা নারীগণ ভস্মীভূত হইত, তাঁহাদের করুণ আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁদিয়া উঠিত, বাঙালীর প্রাণে তাহা সাড়া জাগাইত না। সে বীভৎস দৃশ্যের কথা ভাবিতে পারিনা। চিতা সজ্জিত হইয়াছে। মৃত স্বামীর সহিত হতভাগিনী বিধবাকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বক্ষণেই হয়ত হতভাগিনীকে ভাঙ্গ, চরস, ধুতুরা খাওয়াইয়া অর্ধোন্মত্ত করা হইয়াছে। এইরূপ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় উহাকে চিতায় বাঁধিয়া দিয়াছে। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করিল। যমদূতের মত জোয়ান দুই ব্যক্তি প্রকাণ্ড কাঁচা বাঁশ চিতার উপর চাপিয়া ধরিয়াছে—সতী যাহাতে ছুটিয়া পলাইতে না পারে। হঠাৎ তুমুল কোলাহলে দেখা গেল সতী চিতায় নাই। চিতার অসহ্য অগ্নি-উত্তাপ সহিতে না পারিয়া হতভাগিনী অর্ধদগ্ধ শরীরে জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে বা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে। অমনি চারিদিকে লোক ছুটিল। হায় হায়! হিন্দু ধর্ম রসাতলে গেল, কুলে কলঙ্ক পড়িল, শাস্ত্র অশুচি হইল! গভীর জঙ্গল হইতে সেই ভীত ও মৃতকল্প রমণীকে আবার জোর করিয়া চিতায় তুলিয়া দিল। ঢাকঢোল জোরে বাজিয়া উঠিল। হতভাগিনীর শত অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হইল—চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল—কাহারও পাষাণ হৃদয় টলিল না। তুমুল হরিধ্বনিতে নারীর আর্তনাদ ডুবিয়া গেল—সহস্রশীর্ষ হুতাশন লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া সব শেষ করিয়া দিল। যে বা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিল, লগুড় ও বৈঠার আঘাতে তাহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। হিন্দুধর্ম রক্ষা পাইল—হিন্দু সমাজ অটুট রহিল! হায় রে ধর্ম—হায় রে সমাজ!

এই সতী-দাহের কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চয় করিয়া

বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি, গভর্নমেণ্ট ও তাহার কর্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন অন্ততঃ এইরূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৫।৬ শত অনাথা রমণীকে এইরূপে নিহত করা হইত।"

এই সময়ে সতীদাহের যে তালিকা রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কলিকাতা বিভাগেই এই নারীহত্যা সবচেয়ে বেশী অনুষ্ঠিত হইত। বোধ হয়, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের সংখ্যা অনেকটা ঠিক, দূরবর্তী স্থানসমূহের সংখ্যা যথাযথ ভাবে লিখিত হওয়া সেকালে আশা করা যায় না।

যিনি সতীদাহ প্রথা রহিত করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, সেই মহানুভব লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮ সালে জুলাই মাসে ভারতের গভর্নর-জেনারল নিযুক্ত হইলেন। ১৮২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের জন্য গভর্ণমেণ্ট সামান্যই চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে গেলে ১৭৮৯ সাল হইতে এ সম্বন্ধে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি পড়ে। এই সালে শাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ একটি স্ত্রীলোককে পত্যনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ এই নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করিয়া লিখিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া ইহা বন্ধ করা সমীচীন নয়। ইহার পর ১৮০৫ সালে লর্ড ওয়েলেস্লীর সময়ে নিজামত আদালতের হিন্দু পণ্ডিতদ্বারা সহমরণ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগকে পরিজ্ঞাত করা হয়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত সতীদাহ ম্যাজিষ্ট্রেট্দের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট আদেশ বা উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ কর্মচারীদের কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য ১৮১৭ সালে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৮১৫ সাল হইতে সতীদাহের সংখ্যার হিসাব রাখা হইতে থাকে।

১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে রামমোহন সতীদাহ নিবারণকল্পে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি পর পর তিনখানি পুস্তক লিখেন। উহা কথোপকথনচ্ছলে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ নামে লিখিত। উহার দ্বিতীয় পুস্তক ১৮২০ সালে এবং তৃতীয় পুস্তক ইহার দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তকে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম সমস্তই শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে; সহমরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনামূলক ; অতএব তাহা শাস্ত্রানুসারে গর্হিত ও অকর্তব্য।"

ইহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুস্তকখানি লেডী হেষ্টিংএর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে গভর্নমেণ্ট হইতে সতীদাহ সম্বন্ধে পুলিসকর্মচারি-গণকে যে সকল আদেশ-উপদেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করার জন্য কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি এক আবেদন-পত্র বড়লাট হেষ্টিংসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার বিরুদ্ধে ১৮১৮ সালে আর এক আবেদন প্রেরিত হয়। ইহা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাই সকলের বিশ্বাস। ইহাতে সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচার নিবারণকল্পে গভর্নমেণ্ট যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ন্যায্য ও আবশ্যক বলিয়া সমর্থন করা হইয়াছিল। রামমোহনের এই সকল প্রচারের ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাদের আক্রমণ অতিশয় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। রামমোহন স্বীয় পত্রিকা সংবাদ-কৌমুদীতে সহমরণের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে পুস্তক, পত্রিকা, তর্কালোচনা ও রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ দ্বারা রামমোহন প্রবল ভাবে এই আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। দেশময় একটা বিষম আলোড়ন পড়িয়া গেল। শুধু ইহাই নহে। রামমোহন নিজের বন্ধুদের লইয়া একটি দল করিলেন। যেখানে কোন সহমৃতার খবর পাইতেন, সেইখানে অমনি দৌড়াইয়া

যাইতেন। সেজন্য সেই বিরাট পুরুষকে কত না অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রামমোহন কি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিতেন? তবু ত শ্মশানে শ্মশানে ছুটিয়া যাইতেন, যুক্তিতর্ক দিয়া সহমৃতার আত্মীয়-স্বজনদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন।

লর্ড হেষ্টিংসের পরে ১৮২০ সাল হইতে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্নর-জেনেরেল ছিলেন। অন্যান্য প্রধান রাজকর্মচারী-দিগের মত থাকিলেও আমহার্ষ্ট সতীদাহ প্রথা একেবারে স্থগিত করার জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ করা ভাল বোধ করিলেন না। আমহার্ষ্টের পর ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক গভর্নর-জেনেরল হইয়া আসিলেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

বেন্টিঙ্কের সহিত রামমোহনের পরিচয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের সাহায্য ও পরামর্শের জন্য লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক রামমোহনের নিকট একজন এডিকং পাঠাইলেন। রাজা উত্তর দিলেন—"আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মানুশীলনে ব্যস্ত আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া লাট সাহেবকে জানাইবেন যে আমার রাজদরবারে উপস্থিত হইবার বড় ইচ্ছা নাই।" এডিকং যেরূপ শুনিলেন, লাট সাহেবকে অবিকল যাইয়া তাহাই বলিলেন। বেন্টিঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রামমোহন রায়কে কি জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন?" এডিকং উত্তর দিলেন—"আমি বলিয়াছিলাম যে গবর্নর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি সুখী হইবেন।" বেন্টিঙ্ক উত্তর দিলেন—"আপনি আবার যান এবং তাঁহাকে বলুন যে মিঃ উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহিত আপনি অনুগ্রহপূর্বক দেখা করিলে, তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।" এডিকং পুনরায় যাইয়া রামমোহনকে বলিলেন। রামমোহন লাট সাহেবের এই সৌজন্য ও ভদ্রতা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ইহার পর হইতে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইণ্ডিয়া গেজেটে (১৮২৯, ২৭শে নভেম্বর) রামমোহনের বিষয়ে এইরূপ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল— "এদেশীয় অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি অনেক দিন হইতে, সভ্য রাজপুরুষগণের সাহায্যকারী এবং মনুষ্যজাতির হিতকারিরূপে এই গুরুতর বিষয়ে (সতীদাহ) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উৎসাহসহকারে এবিষয়ে মতামত পত্রের আকারে গভর্ণর-জেনেরলের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তিনি গভর্ণর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, গভর্ণর-জেনেরেল মহা অভ্যর্থনা সহকারে, আগ্রহের সহিত এই কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে গভর্ণর-জেনেরেল তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত করিবেন।"

রামমোহনের নিকট হইতে বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণে হিন্দু শাস্ত্রীয় সমর্থন লাভ করিলেন। বেন্টিঙ্ক দৃঢ়চেতা কর্মিষ্ঠ লোক ছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টের মত প্রতীক্ষাপরায়ণতা তাঁহার ধাতে সহিত না। তিনি দেখিলেন, শাস্ত্রীয় যুক্তি থাক্ বা না থাক্, সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করিলে সর্বশেষে তলোয়ারের উপর নির্ভর করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে। তিনি সৈন্যদলের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিলেন। উনপঞ্চাশ জন সুদক্ষ সেনাপতি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে সতীদাহ রদ হইলে সেনাদলের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে না। উহাদের মধ্যে ২৪ জন অবিলম্বে সতীদাহ রদ করিবার মতে সায় দিলেন। মাত্র পাঁচ জন কোন পরিবর্তন ইচ্ছা করিলেন না। কাজেই সেনা বিভাগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল। বিচার বিভাগের ৫ জন বিচারকের মধ্যে ৪ জন অবিলম্বে সতীদাহ রদের প্রস্তাবে সায় দিলেন। পুলিশও উহা রদের জন্য এক পা'য় দাঁড়ানো। দেশের অধিবাসীর মধ্যেও রামমোহনের দল বেণ্টিঙ্কের সহায়কারী হইলেন। অতঃপর বেণ্টিঙ্ক আর বিলম্ব করিলেন না। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ নিষেধ করিয়া

আইন জারী করা হইল। হিন্দু সমাজে যেন একটা বোমা পড়িল। বিষম চাঞ্চল্য সমগ্র দেশময় একটা তোলপাড় উপস্থিত করিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। কলিকাতার ৮০০ শত অধিবাসীর নাম স্বাক্ষর সহ এক আবেদন গভর্ণর-জেনেরেলের নিকট উপস্থাপিত করিয়া সতীদাহ রদ আইন প্রত্যাহৃত করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। উহার সঙ্গে ১২৮জন পণ্ডিতের অভিমত প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া মফঃস্বল হইতে ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এবং ২৮ জন পণ্ডিতের অভিমত সহ আর এক আবেদন-পত্র বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইল।

ওদিকে এই আইনের স্বপক্ষে কলিকাতায় ৮০০ শত ক্রীশ্চান অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত অভিনন্দনপত্র এবং ৩০০ শত অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত অন্য এক অভিনন্দন-পত্র রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ বেণ্টিঙ্ক সাহেবের নিকট উপস্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করিলেন। ইহার পরদিনই গোঁড়া হিন্দুসমাজ উপলব্ধি করিলেন যে, হিন্দুসমাজকে সংঘবদ্ধ না করিলে সতীদাহ রদ-আইন রোধ করা যাইবে না। তখনই রাতারাতি ‘ধর্মসভার’ প্রতিষ্ঠা হইল। প্রথম দিনের মিটিংএই ১১,২৬০৲ টাকা চাঁদা উঠিল। সে কী উৎসাহ! তাঁহাদের মুখপত্র ‘সমাচার-চন্দ্রিকা’ রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহারই প্রতিবাদস্বরূপ রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। ১২৮ জন পণ্ডিতের মত খণ্ডন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজ যখন দেখিলেন, ভারতবর্ষে ইহার রদ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, অবশেষে উহারা বিলাতে পার্লামেণ্টে আপিল করিলেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার অন্যতম কারণ ছিল এই সতীদাহ রদ আইন যাহাতে পার্লামেণ্টে পাশ হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। ১৮৩৩ সালের নভেম্বর মাসের

১১ জুলাই পার্লামেণ্ট ইহা পাশ করিলেন। ধর্ম সভার আপীল অগ্রাহ্য হইল।

বাংলার বুক হইতে এক মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ অকস্মাৎ কালের অতল গর্ভে লীন হইয়া গেল।

রামমোহন জাতিভেদের বিরুদ্ধে বজ্রসূচি নামক মৃত্যুঞ্জয়াচার্য-প্রণীত এক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নারী-সমাজের কল্যাণব্রতে

সতীদাহ নিরোধের আন্দোলন নারীসমাজের উন্নতিকল্পে রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহারই জন্য তাঁহার জীবন পর্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। সতীদাহের কথা বলা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে নারীসমাজের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে রামমোহন কি ভাবিয়া গিয়াছেন এবং করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

রামমোহন নারীজাতিকে কী যে উন্নত ও মহৎ দৃষ্টি দিয়া দেখিতেন, তাহা তাঁহার রচিত সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাবসমূহে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। নারীকে কোন দিনও তিনি অসম্মান বা অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নাই। ইহাদেরই নানা সমস্যা তাঁহার চিত্তকে ক্লিষ্ট করিয়াছিল। তাই তিনি পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা ছাপিয়া ইহাদের করুণ কাহিনী লিখিয়া হিন্দুসমাজের কুলিশ-কঠোর প্রাণে চেতনা আনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বহুবিবাহ সেকালে হিন্দুসমাজের এক বিষম কলঙ্ক ছিল। উহার ফলে নারীকে আত্মসম্মান ও মর্যাদা হারাইয়া সারা জীবন দুর্বহ দুঃখে কাটাইতে হইত। তিনি হিন্দুশাস্ত্র ঘাটিয়া প্রমাণ

করিতে লাগিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলে দারান্তর গ্রহণে বিধি আছে এবং তাহা সার্বজনীন নয়। বহুবিবাহ নিবারণের জন্য তিনি রাজবিধির আবশ্যকতা অনুভব করিতেন।

সেকালেও দেশে কন্যাপণের প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা ইহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে বেশী অর্থ পাইয়া কন্যাকে রুগ্ন, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গের নিকট বিবাহ দেওয়া হইত। এই সকল কন্যার দুর্দশার সীমা ছিল না। রামমোহন, মনু প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ইহার অন্যায্যতা ও অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করেন।

রাজার সব চেয়ে বড় প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন। হিন্দু সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থায় মৃত পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার নাই। তাহাদিগকে জীবিত কালে স্বামীর, স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের তথা পুত্রবধূর গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্যও এরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া থাকা ছাড়া তাহাদের অন্য পন্থা নাই। ইহার ফলে প্রত্যেক পরিবার কী যে বৈষম্য ও বিবাদের কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

রামমোহন এই প্রথার বিরুদ্ধে হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রণেতৃগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া তীব্র আন্দোলন করেন। তিনি বলিলেন, প্রাচীন ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মৃতস্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রগণের ন্যায় স্ত্রীও সমান অধিকারিণী। একাধিক পত্নী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই স্বামীর সম্পত্তির সমান অংশভাগিনী। রাজা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পরবর্তী দায়ভাগকারগণ প্রাচীন শাস্ত্রবেত্তাদের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া পতিবিত্ত সম্বন্ধে হিন্দুনারীর অধিকার খর্ব করিয়াছেন ; এমন কি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অপুত্রক পুত্রের মৃত্যু হইলে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে পুত্রবধূ, পুত্রের মাতা নহে।

তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দু বিধবার বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্টদায়ক। বঙ্গদেশে সহমরণের সংখ্যাধিক্যের ইহাও এক কারণ। আবার এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতেই বহুবিবাহের এত আধিক্য। কারণ, পুরুষ যদি জানিত একাধিক বিবাহ করিলে প্রত্যেক স্ত্রী-ই সম্পত্তির অংশভাগিনী হইবে, তাহা হইলে তাহার বহুবিবাহের ইচ্ছা অনেকটা দমিত হইত। যেহেতু যতই কেন বিবাহ করি না, স্ত্রী বিত্তের অংশভাগিনী হইবে না এবং এমন কি তাহার ভরণপোষণের জন্যও আইনতঃ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে না, এরূপস্থলে বহুবিবাহ অবাধে চলিবে, ইহাতে আর সংশয় কি ?

যে কালে নারী ছিল ঘুমন্ত—শুধু নারী কেন, পুরুষও যখন নিজের সাধারণ নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অন্ধ ছিল, যখন য়ুরোপেও নারীর অতি শোচনীয় অবস্থিতি ছিল, সেই অনালোকিত যুগে নারীর প্রতি অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নারীর স্বাধিকার সমুদ্ধারের কল্যাণব্রতে একাকী রামমোহনের বিরাট পৌরুষ সিংহ-বীর্যে উদ্যত হইয়াছিল। আজিকার নারী-প্রগতির যুগে বারবার নবযুগের এই ঋষির পূত চরণে তাঁহার দেশবাসী নতি জানাইতেছে।

সাহিত্য-স্রষ্টা রামমোহন

রাজা রামমোহনকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনয়িতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্য সামান্যই ছিল। অনেকদিন হইতেই বাংলায় একটি সমৃদ্ধ পদ্য সাহিত্য ছিল। উহা প্রায় হাজার বছর যাবৎ আছে। কিন্তু গদ্য সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। রামমোহনের পূর্বে ও সমসাময়িক কালে বাংলা গদ্যের সাধারণতঃ দুইটি ধারার সূচনা হইয়াছিল। একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লিখিত সংস্কৃত-ঘেষা পণ্ডিতী বাংলা, দ্বিতীয়টি পাদ্রীদের লিখিত চলতি বাংলা। রামমোহনের ভাষায় এই দুই ধারার সামঞ্জস্য হইয়াছে। ইহাকে আমরা প্রাথমিক সামঞ্জস্য বলিতে পারি। ইহার পরে বঙ্কিমচন্দ্রে বাংলা ভাষা অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয় প্রয়োজনের খাতিরে, নিছক রস-সৃষ্টির জন্য যে সাহিত্য তাহা জন্মলাভ করিয়াছে অনেক পরে। রামমোহনের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও ছিল এই প্রয়োজন-বোধ। তাই রামমোহন যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা একান্ত ভাবে লোকশিক্ষার জন্যই।

পূর্বেই বলিয়াছি, গদ্য কিরূপে পড়িতে হয়, সেকালে লোকের তাহা জানা ছিল না। রামমোহনকে তাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ বেদান্ত ভাষ্যে গদ্য পঠনের নিয়ম-কানুনও লিখিয়া দিতে হইয়াছে। এদিক্ দিয়া পরবর্তী কালের বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের ন্যায় রামমোহনকে বাংলা সাহিত্যের স্কুল মাষ্টারি করিতে হইয়াছে। অবশ্য রামমোহন স্কুলপাঠ্য বইও লিখিয়াছেন।

রামমোহনের রচনা সকল মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। তাঁহার বেশীর ভাগ রচনা ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয়; উহা অনুবাদ সাহিত্য ও আলোচনা-মূলক সাহিত্যের অন্তর্গত। এই সকল বিষয়ে প্রধান প্রধান গ্রন্থের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। উহা ছাড়া তিনি আরো কয়েকখানি ছোট পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ', 'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং', 'গায়ত্রীর অর্থ', 'অনুষ্ঠান', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'প্রার্থনাপত্র', 'আত্মানাত্ম-বিবেক', 'ক্ষুদ্র পত্রী' উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর রামমোহনের সংবাদ সাহিত্য। এবিষয়ে তাঁহাকে এদেশে সকলের অগ্রণী বলা যায়। এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব।

রামমোহন বিদ্যালয়-পাঠ্য যে সকল পুস্তক লেখেন তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতির কথা জানা যায়। ইহার মধ্যে ব্যাকরণখানা এখনও আছে। অপরগুলির কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ব্যাকরণখানা গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ।

রামমোহনের আর একটি বিশেষ দান তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত। আধুনিক ব্রহ্মসঙ্গীতের সূচনা ইহাতে দেখিতে পাই। আবার এদেশীয় সাধকগণের 'ভাবের গানের' প্রতিচ্ছায়াও উহাতে পড়িয়াছে। সকল সঙ্গীতেরই ভাব প্রায় একরূপ। নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ, সংসারের অনিত্যত্ব, আমিত্বের অহঙ্কার ত্যাগ —ইহাই অধিকাংশ গানের মূল কথা। দুই একটি গান উল্লেখ করিতেছি।

ইমন কল্যাণ—তেওট

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

সাহানা—ধামাল

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাকে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভালো নয়।

গৌড়মল্লার—আড়াঠেকা

সঙ্গের সঙ্গীরে মন কোথা কর অন্বেষণ
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ?
যে বিভু করে যোজন কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ
মার্জিয়া মনদর্পণ তারে কর দরশন।

রামকেলী—আড়াঠেকা

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান ত্যজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

শিক্ষা-বিস্তারে

১৮১৬ সালের কথা। এই সময়ে পুরাতন হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড্ হেয়ার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড্ ঈষ্টের উৎসাহে ও নেতৃত্বে হিন্দু কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হন। রামমোহনের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি হেয়ার সাহেবকে খুব উৎসাহ দিলেন। সমাজের নেতৃস্থানীয়দের আহ্বান করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, রামমোহনের নাম ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে আমরা ইহাতে থাকিতে পারি না। হেয়ার সাহেব রামমোহনকে এই কথা জানাইলেন। রামমোহন অম্লান বদনে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, উহার সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। মহাপুরুষোচিত উদার কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নই।"

এদেশে সেই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল চাহিতেছিলেন, দেশে সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষার প্রচলন হোক। অপর দল ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন বুঝিয়াছিলেন দেশের লোককে যদি যথার্থ মানুষ করিতে হয়, তবে চাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। যে জাতি সহস্র বর্ষ ধরিয়া শুধু 'টিপ্ করিয়া তাল পড়ে না, তাল পড়িয়া টিপ্ করে', 'ডান হাতে খাবে না বাম হাতে খাবে', 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' এই প্রকার গবেষণা করিয়া জীবন কাটাইয়াছে সেই জাতিকে কর্মঠ ও সমর্থ করিয়া তুলিতে হইলে

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। যাহাতে এই শিক্ষা দেশে প্রচলিত হয় তাহার জন্য তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একখানি সুদীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছিলেন। উহা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার বিষয়ক একখানি মূল্যবান দলিল। উহা সুযুক্তি ও আন্তরিকতায় পূর্ণ।

এই সকল আন্দোলনের ফলে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকা স্থাপনের ভিত্তির প্রস্তরখণ্ডে হিন্দুকলেজের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং উভয় কলেজের একত্র ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল।

ইহার বছর খানেক পরেই রামমোহন একটি সুন্দর বাটী নির্মাণ করিয়া বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট যে চিঠিখানি লিখেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন, বেদান্ত চর্চাদ্বারা আমাদের যুবকগণ কখনও সমাজের উন্নত ও কর্মক্ষম সভ্য হইতে পারিবে না। সংস্কৃত শিক্ষা দ্বারা দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে। অথচ ইহার পরেই তিনি নিজেই বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? রামমোহন সংস্কৃত সাহিত্য বা শাস্ত্রাদি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। এমন কি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যাহাতে টোলগুলিকে সাহায্য করেন, তাহার কথাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন প্রচলিত শিক্ষা-বিধির যাহা বাস্তবিকই মানুষকে অমানুষ করিয়া তুলিত।

ডাফ্ সাহেবের কথা পূর্বেও বলিয়াছি। এই মিশনরী সাহেবটি এদেশে আসিয়া ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই সময়ে রাজা রামমোহন তাহার শিক্ষা-প্রচার কার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য ব্রহ্মসভার গৃহ ছাড়িয়া দেন। ডাফ্ সাহেবের স্কুল যেদিন প্রথম আরম্ভ হয় সেদিন

ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিয়াছিল। রামমোহন তাহাদিগকে বলিলেন—“বাইবেল পড়িলেই খ্রীষ্টান হয় না। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খ্রীষ্টীয়ান হই নাই, কোরাণ পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হরেস্ উইলসন সাহেব হিন্দু শাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। বিচার পূর্বক সত্য গ্রহণ করিবে। কেহ তোমাদিগকে বলপূর্বক খ্রীষ্টীয়ান করিতে পারিবে না।” ইহার পর ছাত্রেরা আপত্তি করিল না। প্রায় এক মাস কাল রামমোহন প্রত্যহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। রামমোহন রায়ের নিজের একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। ইহার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ তিনি নিজেই বহন করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই স্কুলে পড়িতেন। ষাটটি ছেলে এখানে পড়িত।

পত্রিকা-সম্পাদন

১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণ তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকা ‘সমাচার-দর্পণে’ বেদান্ত শাস্ত্রের নিন্দা-কুৎসা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন এবং উহার জবাব দিবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। রামমোহন উহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে মিশনরীরা উহা ছাপিলেন না। রামমোহন তাঁহার পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ব্রাহ্মণ-সেবধি ও ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। উহার প্রথম দুই সংখ্যায় মিশনরীদের প্রবন্ধ এবং তৎসহ স্বীয় উত্তর মুদ্রিত করিয়া বাহির করিলেন। এই পত্রিকায় বাংলা ও ইংরাজী দুই অংশ থাকিত। ইহার এক পৃষ্ঠায় ইংরেজী ও অপর পৃষ্ঠায় বাংলা সন্নিবেশিত হইত। ইহা বেশী দিন বাঁচে নাই। শুনা যায়

১২ সংখ্যা পর্যন্ত ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষভাবে পাদ্রীদের সহিত তর্ক আলোচনার জন্যই ইহার জন্ম হইয়াছিল।

রামমোহনের বিখ্যাত পত্রিকা ছিল সংবাদ-কৌমুদী। উহা বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। ১৮১৯ সালে উহা প্রকাশিত হয়। উহার বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছিল। যদিও বিশেষভাবে রামমোহনের মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, লোকশিক্ষা, নীতি-কথা প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প স্থান পাইত। ইহা সর্বসাধারণের পত্রিকা ছিল।

বাংলার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাঙালী বা ভারতীয় সংবাদিকগণের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম পত্রিকা প্রচারে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইয়াছেন।

এই পত্রিকা সম্বন্ধে রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—

"এই সংবাদ-কৌমুদীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমন্বিত যে সকল লোকোপকারী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতীতি হইবে যে রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে পারিতেন তাহা নহে ; জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায় গদ্য রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লিখাতে তাঁহাকে বর্তমান গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা বলিতে হইবে।"

সংবাদ-কৌমুদী হইতে কয়েকটি গল্প বঙ্গীয় পাঠাবলী নামক এক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এবং কয়েকটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দিষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া রামমোহন পারস্য ভাষায় আর একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার নাম ছিল 'মিরাৎ-উল-আখবার'। ১৮২২ সালে উহা প্রকাশিত হয়। উহা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল এবং বিশিষ্ট ও শিক্ষিত সমাজের জন্য ছিল। উহাতে রামমোহন নির্ভীক ভাবে য়ুরোপীয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন, ভারত-গভর্ণমেণ্টের ক্রুটি-বিচ্যুতির কথা লিখিতেন এবং সর্বদা ন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতেন। আয়র্লণ্ডের দুরবস্থার কথা, গ্রীসের জাগরণের কথা ইত্যাদি বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইত। এই কাগজখানি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট প্রেস অর্ডিনান্স জারি করেন। রামমোহন উহার বিরুদ্ধে এদেশে এবং অবশেষে বিলাতে রাজসমীপে পর্যন্ত আবেদন করিয়া 'মিরাৎ' ছাপা বন্ধ করিয়া দেন। ভারতবর্ষে পারস্য সংবাদ-পত্রের সর্ব প্রথম সম্পাদক রাজা রামমোহন। শুধু ভারতে নয়, পারস্যেও ইহার সমাদর ছিল। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল 'মিরাতের' এক বিশেষ সংখ্যায় একটি প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধে কারণ নির্দেশ করিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন-ই-জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা ফরোশ্।

যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

'পারস্য ও হিন্দুস্তানের যে সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া মীরাৎ-উল-আখবারকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট রামমোহন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিবৃতিতে লিখেন—"আমার অনুরোধ যে, আমি যে স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।'

রাষ্ট্রগুরু রামমোহন

নব্য ভারতের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—"For let it be remembered that Rammohan Roy was not only the founder of the Brahmo Samaj and the pioneer of all social reform in Bengal, but he was also the father of constitutional agitation in India. It is remarkable how he anticipated us in some of the great political problems which are the problems of to-day".

রামমোহনের পূর্বে আমাদের দেশের লোকের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে তত সচেতন ছিল না। রামমোহনই সর্বপ্রথম জনসাধারণের অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলেন। সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। সকল ক্ষেত্রেই তিনি ন্যায় ও সত্যের উপাসক ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। বর্তমানে ভারতের সর্ববিধ বৈধ আন্দোলনের সূচনা তিনিই করেন। ভারতবর্ষে জনসাধারণের নাগরিক অধিকার রক্ষার্থ সর্বপ্রথম যে প্রতিবাদ হয় তাহা করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন এবং তাঁহার পাঁচজন বন্ধু। ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে এক মানপত্র প্রদান করেন। তৎকালীন বড়লাট আইন করিয়াছিলেন যে,

অতঃপর সকল পত্রিকাকেই প্রকাশের পূর্বে বড়লাটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। রামমোহন এই স্বাভাবিক অধিকার-চ্যুতির বিরুদ্ধে যে আবেদন-পত্র দিয়াছিলেন তাহা যেরূপ যুক্তিপূর্ণ সেইরূপ তেজস্বী। মানুষের স্বাধীনতা দাবী করিয়া পৃথিবীতে যে কয়খানি পত্র লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। সুপ্রীম কোর্ট উহা অগ্রাহ্য করিলে রামমোহন বিলাতে আবেদন করিলেন। প্রিভিকাউন্সিল ছয় মাস অপেক্ষা করিয়া ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাসে উহা অগ্রাহ্য করিলেন। প্রতিবাদ স্বরূপ রামমোহন তাঁহার মিরাত-উল-আখ্‌বার পত্রিকাখানি এই অসম্মানজনক সর্তে প্রকাশ করিতে অপারগ হইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইহার পর রাজা জুরি বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই আইন অনুসারে যে কোন খ্রীশ্চান জুরীতে বসিতে পারিবেন এবং তিনি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান সকলের বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানের জুরীতে বসিবার অধিকার নাই। এমন কি তাহারা তাহাদের স্বধর্মাবলম্বী যে ক্ষেত্রে বিচারাধীন সে-ক্ষেত্রেও জুরীতে বসিতে পারিবেন না।

রামমোহন এই পক্ষপাতদুষ্ট বৈষম্যের প্রতিবাদ করিয়া আয়র্লণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মসম্বন্ধীয় পার্থক্য ও বিভেদদ্বারা আয়র্লণ্ডের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। রামমোহন হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাক্ষরসহ আবেদন বিলাতে উভয় পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া রাজার ইংরেজ চরিতকার সত্যই লিখিয়াছেন—'ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে।'

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এইরূপ এক নিষ্পত্তি করেন যে "পুত্র বা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যক্তি পৈত্রিক সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে

পারিবেন না।" রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিয়া উহা রহিত করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমি-বিষয়ক যে নূতন আইন এই সময়ে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধেও তিনি বিলাত পর্যন্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন।

রামমোহন যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মনে প্রবলতম ভাবনা ছিল স্বদেশের উন্নতি ও স্বদেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ বদলাইবার সময়। যাহাতে নূতন বন্দোবস্তে স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ থাকে, তাহার জন্য এই সময়ে তিনি কি না পরিশ্রম করিয়াছেন। কত সময়ে দেখা যাইত রামমোহনের উষ্ণীষশোভিত দীর্ঘ দেহ পার্লামেণ্ট-গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের নিমিত্ত পার্লামেণ্ট যে কমিটি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে রামমোহন লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করেন। ভারতের বিচার বিভাগ ও রাজস্ব সংক্রান্ত যে দুইটি সাক্ষ্য তিনি প্রদান করেন, উহা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, আইন জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক। ইহাতে তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পারস্য ভাষার পরিবর্তে আদালতে ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন, দেওয়ানী আদালতে দেশীয় কর-নির্ধারক নিযুক্ত করা, জুরির দ্বারা বিচার প্রবর্তন, বিচারক ও রাজস্ব কমিশনর এবং বিচারক ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক করণ, সিভিল সার্ভিসে বহু সংখ্যক ভারতীয় লোক গ্রহণ, সিভিল সার্ভিসের চাকুরেদের বয়স বৃদ্ধি, কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে জনমত গ্রহণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি জনসাধারণের স্বার্থ ও অধিকারের জন্যও অনেক প্রচেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের কথায় তিনি বলিতেন—"চাষাভূষাদের এমনই দুরবস্থা যে ইহাদের কথা বলিতে গেলে প্রাণে বিষম ব্যথা বাজে।"

সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতা রামমোহনের জীবনের পরম কাম্য ছিল। ১৮২১ সালে স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে শুনিয়া তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, এই উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে নিজব্যয়ে এক বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের খবর সযত্নে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বাধীনতাকামীদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। যখন ইটালীর নেপল্‌স্‌বাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে একদিন কলিকাতায় খবর আসিল, স্বাধীনতা-কামীর দল পরাজিত হইয়াছে। সেদিন রামমোহনের দুঃখের শেষ ছিল না। সেদিন তিনি বাড়ী হইতে এক পা-ও নড়িলেন না। এক বন্ধুর সঙ্গে বিকালে দেখা করিবার কথা ছিল, তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—বিশেষ ভাবে য়ুরোপের সংবাদে আমার মন বড়ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কাজেই দেখা করিতে পারিব না। এই পত্রে তাঁহার মনের গোপনতম বাণী উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে। তাহা এই—

"From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy. Under these circumstances I consider the cause of the Neopolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful."

স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের মনে কী যে তীব্র বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা গুমরিয়া মরিত তাহা উপরের কথায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি হয়। তাই দেখি, যখন তিনি আফ্রিকার উপকূল দিয়া জাহাজে

চড়িয়া ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে অপর জাহাজে সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার বার্তাবহ ফরাসীদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছিল, উহাকে অভিবাদন করিবার জন্য রামমোহন ভাঙ্গা পা লইয়া দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রামমোহনের সেই স্বপ্ন ও সঙ্কল্প তাঁহারই স্বদেশবাসী রূপায়িত করিয়া তুলিবার আয়োজনে জীবন পণ করিয়া অভিযান করিয়াছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তিদূত রামমোহনের তেজোদ্দীপ্ত জীবন ও অমর বাণীর কথায় বলিয়াছেন—

"Sitting at the feet of Rammohan Roy, let us be imbued with his lofty spirit—his love of country, his devotion to truth, his enthusiasm for progress—let us be regenerated by the touch of his great example, and we shall then have acquired the impulse which will carry us on to secure for ourselves a place among the progressive nations of the earth and to accomplish those high destinies which, I fully believe, are reserved for us in the decrees of Providence."

ইংলণ্ডে গমন

বহুদিন হইতেই রামমোহনের বিলাত যাইবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার বিলাত যাত্রার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন —"পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ-শাসন ও ভারতবর্ষবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন।"

বিলাত-যাত্রার পূর্বে দিল্লীর বাদশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাত-যাত্রার সময়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ অনেক বাধা দিয়াছিলেন। যে দেশে শাস্ত্রদ্বারা সমুদ্রযাত্রা চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে দেশে ইহা বিচিত্র নয়। রামমোহনই সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বাধা ভাঙ্গিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মিলনের পথ উন্মোচন করেন। সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বীরের মত 'আলবিয়ন' নামক জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিল রাজারাম নামে তাঁহার (পালিত) পুত্র, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় নামে পাচক ব্রাহ্মণ এবং রামহরি দাস নামে ভৃত্য।

রামমোহনের বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার একজন সহযাত্রী লিখিয়াছিলেন—"জাহাজে রামমোহন রায় তাঁহার নিজের ঘরে

আহার করিতেন ; রন্ধন করিবার স্বতন্ত্র স্থান ছিল না বলিয়া প্রথ অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছিল। জাহাজে কেবল একটি মাত্র সামা মৃণ্ময় চুল্লি ছিল। তাঁহার ভৃত্যেরা সমুদ্র-পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাই লাগিল ; তাহারা ক্যাবিনের মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত, কখ বাহিরে আসিত না। তিনি স্থানাভাব বশতঃ অন্য একটি স্থানে ক করিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি সদয়হৃদয় ছিলেন যে, তাহাদিগ কোনক্রমেই সেখান হইতে অন্তরিত করিতে চাহিতেন না অধিকাংশ সময়ই তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করিতেন। মধ্যাহ্নে পূর্বে ও সন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে বায়ুসেবন করিতেন ; এবং কখ কখন কোন ব্যক্তির সহিত উৎসাহ সহকারে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন জাহাজের যাত্রীসকলের আহারের পর মেজ পরিষ্কৃত হইলে তিনি আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে উপবেশনপূর্বক সকলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। তাঁহার প্রতি জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং সুনীলপ্রসারিত শুভ্রফেন-শোভিত সাগরদর্শন ও তাহার গভীর গর্জন শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন।”

জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল দিয়া যাইবার সময় রাজা রামমোহন ফরাসী পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া উল্লসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—Glory, glory, glory to France. একথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুদীর্ঘ চারিমাস তেইশ দিনে জাহাজ ইংলণ্ডের লিভারপুল বন্দরে পৌঁছিল। রামমোহন সেখানে সাদরে গৃহীত হইলেন। লিভারপুলে সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম রস্কোর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। রামমোহন সেই অষ্টসপ্ততিপর বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় প্রথায় সেলাম করিয়া বলিলেন— “যাঁহার যশ শুধু য়ুরোপে নয়—সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলাম।” রস্কো উত্তর দিলেন—

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আজিকার দিন পর্যন্তও আমি জীবিত রহিয়াছি।"

লিভারপুলে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক শুনিবার জন্য লণ্ডন গমন করিলেন। লণ্ডনে তাঁহার আগমনের সংবাদ শুনিয়া সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত লোকসকল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। রাজাকে দেখিবার জন্য একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডবাসী রামমোহনে ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য, ভারতবর্ষের সভ্যতা, ভারতবর্ষের মর্যাদা, ভারতবর্ষের মহোচ্চতা। দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সর্বত্র রামমোহনের খ্যাতি প্রচারিত হইল।

১৮৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ডাধিপতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাজার অভিষেক-উৎসবে বৈদেশিক রাজদূতগণের সঙ্গে তাঁহার আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যদিও ইংলণ্ডাধিপতি রামমোহনের রাজা উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাঁহাকে ভারতবাসীর প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সহজে উহা স্বীকার পান নাই। এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। অবশেষে উহারাও রাজার মর্যাদা রক্ষার জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেবের ভাইগণ লণ্ডনের বেডফোর্ড স্কয়ারে বাস করিতেন। তাঁহারা রাজাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নিজেদের বাটিতে রাখিয়াছিলেন। রাজা সাধারণতঃ নিজে পৃথক থাকিতেই পছন্দ করিতেন।

ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানগণ লণ্ডনে এক প্রকাশ্য সভায় রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৩১ ও ৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে যে কমিটি নিযুক্ত হয়

তাহাতে রামমোহন লিখিত সাক্ষ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

এই সময়ে রামমোহন স্বদেশের উন্নতিকল্পে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পার্লামেণ্ট কমিটির সাক্ষ্যও মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৩২ সালে রামমোহন ফরাসিদেশে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা গিয়াছিলেন। ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। এই সময়েই একদিন সুপ্রসিদ্ধ কবি টমাস মুরের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হইয়াছিল। উভয়ে এক হোটেলে আহার করিয়াছিলেন। মুরের রোজনামচায় রামমোহনের সম্বন্ধে সুন্দর কথা লেখা রহিয়াছে।

ফ্রান্স হইতে রামমোহন লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে তাঁহাকে অনেক সময়ে পার্লামেণ্ট গৃহে দেখা যাইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে তিনি নিয়মিত ভাবে উক্ত সভাগৃহে উপস্থিত থাকিতেন। এই জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত এবং চিন্তিত দেখা যাইত। কুমারী কাসেলকে এই সময়ে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—"অদ্য কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হইবে। কমিটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্ক-বিতর্ক দ্বারা কার্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইয়াছে। কমন্স সভায় এই পাণ্ডুলিপি পাশ হইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে তাহা আমি শীঘ্রই নির্ধারণ করিতে পারিব। তখন আমি উহার শেষ ফল শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া লণ্ডন ত্যাগ করিব। পর সপ্তাহে আমি ব্রিষ্টল যাত্রা করিব।"

যুগগুরু ও দেবেন্দ্রনাথ

"ইংলণ্ডে গমন করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনাথের এই কথা হইতে বুঝা যায়, রামমোহনের এক নিগূঢ় প্রভাব মহর্ষির জীবনে ক্রিয়াশীল ছিল। ধর্মের দিক্ দিয়া রামমোহনের ভাবধারার উত্তরাধিকারী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। এই বিশ্বাস মহর্ষির জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিল।

রামমোহনের এই প্রভাবের কথা মহর্ষি নিজেই বিবৃত লিখিয়াছেন।—

"রাজার এমন শক্তি ছিল যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই নাই। যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। আমি তাঁহারদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।"

বাল্য জীবনী

কলিকাতার ঠাকুর পরিবার সুপরিচিত। এই একটী পরিবার শতাব্দী যাবৎ বাঙালীর জাতীয় জীবনের নানাদিক্ দিয়া যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইতিহাসে এরূপ বড় দেখা যায় না।

এই বংশে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ীতে ১৮১৭ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ছিল। দ্বারকানাথ সেকালের বিখ্যাত ধনী ও জমীদার ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত অর্থের খ্যাতি কিংবদন্তী *হইয়া রহিয়াছে। ঐশ্বর্যের আতিশয্যে বিলাতে তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ আখ্যা পাইয়াছিলেন।*

এই ঐশ্বর্যশালী পরিবারের অভ্যন্তরে একটী চমৎকার সরল শ্রী ছিল। বাল্য বয়সে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দিদিমার নিকট মানুষ হন। এই কথা উল্লেখ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলিয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কান্দিতাম। ধর্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। * * * আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাটীতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতাম, কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভালবাসিতাম না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষদিয়া শান্তভাবে সমস্ত দেখিতাম।”

দেবেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে বাড়ীতেই অধ্যয়ন করিতেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও পারসী—এই চারি ভাষা তাঁহাকে পড়িতে হইত। ব্যায়াম ও সঙ্গীতাদিও শিখিতে হইত।

ইহার পর দ্বারকানাথ তাঁহাকে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। চৌদ্দ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই খানে দুই বছর কি তিন বছর পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে হিন্দু কলেজে ডি রোজিও প্রমুখ সংস্কারপন্থী শিক্ষকদের শিক্ষার ফলে যুবকগণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ও স্বদেশীয়ানার উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার ছাপ দেবেন্দ্রনাথের মনে তেমন দাগ কাটে নাই। বাল্যকাল হইতেই স্বদেশীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার একটা দরদ ছিল। তাঁহার মনের গতিও অলক্ষ্যে অন্য পথে চলিতেছিল।

নব জীবন

তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স আঠার বছর। সেই সময়ে তাঁহার বাল্য জীবনের সাথী স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু দেবেন্দ্রনাথের মনে এক গভীর ভাব জাগাইয়া দিয়া গেল। সেই কথা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলি।

“আমি সেই সময়ে (দিদিমার মৃত্যুকালে) গঙ্গাতীরে নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব দিন রাত্রিতে ঐ চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি,—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নামসঙ্কীর্তন হইতেছিল,—“এমন দিন কি হবে, হরিনাম ব'লে প্রাণ যাবে।” বায়ুর সঙ্গে তাহার অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল।

"এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্বের মানুষ নাই। ঐশ্বর্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা দুলিচা সকলই হেয় বোধ হইল। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন আঠার বৎসর।

"এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই। কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালে সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্বথা দুর্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন।

"কে বলে ঈশ্বর নাই, এই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি ত প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হতে এ আনন্দ পাইলাম?"

ইহার পর তাঁহার মনে এক গভীর বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবন শুক্ন, নীরস, বৈরাগ্যময়। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন—"বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছু পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্গীয়, সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য।"

এইরূপ মনের অবস্থা লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিষয়-বৈরাগ্য তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিল না। তিনি সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হইলেন। ঈশ্বরের জ্ঞান লাভের জন্য তিনি যত্নের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন দৈবক্রমে

একখানি উপনিষদের ছেঁড়া পাতা বাতাসে উড়িয়া তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। উহাতে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি লিখিত ছিল।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং॥

যাহা-কিছু এই জগতের সকলকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন কর। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাই ভোগ কর। অন্য কাহারো ধনে লোভ করিও না।

গৃহ ও পরিবারের পৌত্তলিক আবহাওয়ায় বর্ধিত হইলেও বাল্যকাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথের মনে এক-ব্রহ্মের ভাব বলবত্তর ছিল। অলক্ষ্যে রামমোহনের প্রভাব ছিল কিনা, কে জানে? এক্ষণে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ উহাকে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিল।

এই শ্লোকটি পাইয়া দেবেন্দ্রনাথের মনের দুয়ার যেন খুলিয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, 'ঈশ্বরদ্বারা সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর।' আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। আহা, সেদিন আমার পক্ষে কি শুভ দিন—কি পবিত্র আনন্দের দিন। উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ পরম উৎসাহে ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি বিখ্যাত উপনিষদ্‌গুলি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্ম-সমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট তিনি এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কথা একটু বলা ভাল। রাজা রামমোহন রায় যখন রংপুরে ছিলেন,

সেই সময়ে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামক এক তান্ত্রিক অবধূতের সঙ্গে অত্যন্ত সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। রামচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ ইঁহারই ছোট ভাই। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজের ইনিই প্রথম আচার্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ চতুর্দশবর্ষ ব্রহ্মসভার ক্ষীণ প্রদীপটিকে পরম স্নেহে, যত্নে ও শ্রদ্ধায় প্রজ্জ্বালিত রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৩ সালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোকগমন করেন।

ধর্মদীক্ষা ও ধর্মসাধন

মানুষের মনে যখন কোন নূতন ভাব জাগে, তখন তাহার মনের তীব্র ব্যাকুলতা তাহাকে পাগল করিয়া তুলে। দেবেন্দ্রনাথের মনের অবস্থাও এমনি হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তখন সেই ভাব প্রচার করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ফলে ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। তত্ত্ববোধিনী সভায় ঈশ্বর-বিষয়ক বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যাদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা হইত। এই সময়ে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনীর পাঠশালা ও পরে পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসভায় যোগদান করিলেন এবং ঐ বছরই তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রহ্মসভা এক হইয়া গেল। উভয়ের একই লক্ষ্য ছিল—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার। তখন ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া কোন কথা ছিল না তত্ত্ববোধিনী সভা বা ব্রহ্মসভা যে ধর্ম প্রচার করিতেন তাহার নাম ছিল 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম'।

১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ২১ জন যুবক-বন্ধুর সহিত বৃদ্ধ আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রহ্মসমাজ গৃহে

ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে বিধিপূর্বক পৌত্তলিকতা ত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মোপাসক-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিল, ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম নামকরণও এই সময়েই হইল। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম।...পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না। ধর্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম।" এই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিনটি দেবেন্দ্রনাথ পরম পবিত্র মনে করিতেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই দিনে শান্তি-নিকেতনের আশ্রমে উৎসব ও মেলার আরম্ভ হয়। এখনও ৭ই পৌষ সেখানকার বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে।

দেবেন্দ্রনাথের বহিরঙ্গ সাধনপ্রণালী সামান্যই ছিল। অন্তরঙ্গ সাধনাই তিনি জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন বিশেষভাবে। প্রথম বয়স হইতে গায়ত্রীজপ তাঁহার সাধনার অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল। পরে উপনিষদের গভীর ও উদার শ্লোক এবং হাফেজের রসোপম কাব্য তাঁহার জীবনের সহচর ছিল। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যে সেই পরম সুন্দরের সঙ্গলাভ তাঁহার জীবনের বড় সাধনা ছিল। তাই তিনি বাড়ী থাকিতেন বড় কম। নদীতে নদীতে, কাননে কান্তারে, পর্বতে উপত্যকায় তাঁহার দিন কাটিয়াছে। জ্ঞান তাঁহাতে ভক্তিতে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, প্রেমে মধুর হইয়া ফুটিয়াছে।

১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ যখন গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে এক ঝড়ের রাতে অকস্মাৎ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ আসিল। বিলাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু যে কত বড় দুর্যোগ বহন করিয়া আনিয়াছিল দেবেন্দ্রনাথ তাহা তখন কিছুই জানিতেন না। দ্বারকানাথ প্রায় ক্রোড় টাকা ঋণ রাখিয়া যান।

কিন্তু তিনি অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তি এমন কৌশল করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন যে পাওনাদারদের তাহার উপর হাত দিবার যো ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলেই ফাঁকি দিতে পারিতেন। সকলেই পরামর্শ দিল, বিষয় লুকাইয়া ফেল, পাওনাদারদের ফাঁকি দাও। দেবেন্দ্রনাথ একগুঁয়ে হইয়া বলিলেন, "না, প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না। সমুদয় বিষয় ধরিয়া দিব, ফকির হই হইব, অধর্ম করিতে পারিব না।" তিনি সমুদয় বিষয়-সম্পত্তির তালিকা করিয়া পাওনাদারদের হাতে দিলেন। তিনি যখন এই তালিকা দিতে বাড়ীর বাহিরে যান তখন অন্তঃপুরে কান্নার রোল উঠিল। সম্পত্তির তালিকা করিবার সময় দেবেন্দ্রনাথ হাতের আংটীটি লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তালিকা পড়িবার সময় বলিয়া উঠিলেন,—"এই আংটীটা আমার হাতে আছে ; আমার বিষয় সম্পত্তির তালিকার মধ্যে ইহাও ধরা উচিত।"

দেবেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার ফল ভালই হইল। পাওনাদারগণ বিষয়-সম্পত্তি নিলেন না, দেবেন্দ্রনাথ নিজের হাতে সম্পত্তি রাখিয়া চল্লিশ বৎসরে এই ঋণ শোধ করেন। দ্বারকানাথ কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীতে এককালীন একলক্ষ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসরের পর সুদসমেত ঐ টাকা পরিশোধ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের এই সত্যনিষ্ঠায় সেকালে লোকে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান লইয়া দেবেন্দ্রনাথকে মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। যদিও শ্রাদ্ধক্রিয়া হিন্দুরীতিতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি মাত্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে এবং উহার প্রচারের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি বেদাদি গ্রন্থ যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া উপনিষদের ভিত্তির উপর

ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচনা করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলেন।—উপনিষদের সত্যগুলি তাঁহার মনে যেমন যেমন আসিতে লাগিল, তিনি তেমন তেমন বলিতে লাগিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাহা লিখিয়া গেলেন। এইরূপে ব্রাহ্মধর্মের বেদস্বরূপ ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল।"

দেবেন্দ্রনাথ প্রতি বছর পূজার সময় বেড়াইতে বাহির হইতেন। এখন হইতে দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেবেন্দ্রনাথের নানা জায়গায় ভ্রমণ করিতে হইত। ১৮৪৬ সাল হইতে ১৮৫৪ সালের মধ্যে বাংলা দেশে মেদিনীপুর, ঢাকা, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি এগারটি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজের ঝঞ্ঝা দেবেন্দ্রনাথ খুব কমই সহিতে পারিতেন। তাই প্রায়ই তিনি নির্জন স্থানে—পর্বতের গায় বা নদীর বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ১৮৫৬ সালে আশ্বিনমাসে তিনি হিমালয় ভ্রমণে বাহির হইলেন। সমস্ত উত্তর ভারত বেড়াইয়া অবশেষে শিমলা যাইয়া পৌঁছিলেন। তখন দেশে সিপাহি বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ শিমলায় ক্রমশঃ উচ্চতর পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। একদিকে প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য আর হাফেজের বয়াৎ তাঁহার জীবনের সঙ্গী হইল। দিনে এবং রাত্রিতে তন্ময় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ রস পান করিতেন। যে রাত্রিতে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতেন সে রাত্রে আনন্দে গাহিয়া উঠিতেন—

"আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিয়ো না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু বিরাজমান।"

এই ভাবে বছর দুই বেড়াইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন।

বিষয়ী ও বিরাগী

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ কি পনর বছর, সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার স্ত্রী সারদাসুন্দরীর বয়স মাত্র ছয় বছর ছিল। তিনি যশোহরের রায়-চৌধুরী বংশের মেয়ে ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে সুপুরুষ ছিলেন, সারদা দেবীও পরমা সুন্দরী ছিলেন।

যৌবনারম্ভে দেবেন্দ্রনাথ সংসারবিরাগী। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি সকল প্রকার পূজাপার্বণে যোগ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। দিনরাত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-ধ্যানে বিভোর থাকিতেন। এরূপ স্বামী লইয়া কোন গৃহস্থ বধূ সুখী হইতে পারে না। সারদা দেবী নিজে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে। কিন্তু স্বামীর বৈরাগ্যে তিনিও কোন পূজাপার্বনে যোগ দিতেন না। তাঁহার জায়েরা আসিয়া সাধাসাধি করিতেন, তিনি একা ঘরে পড়িয়া থাকিতেন।

সারদাদেবীর একটী করুণ চিত্র এই ঘটনাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একবার ১৮৪৬ সালে ঘোর বর্ষাতেই দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। সারদাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতে হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।' দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জন্য আর একটা পিনিস ভাড়া করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের স্নেহশীল প্রাণ পত্নীকে চিরদিনই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

রামমোহনের সময় হইতেই খৃষ্টানদের সহিত হিন্দুদের বিবাদ আরম্ভ হয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৪৫ সালে একটী ঘটনায়

হিন্দু সমাজে একেবারে বোমা পড়িল। এই বছর একটী নাবালক ছেলে তাহার পত্নীর সহিত প্রসিদ্ধ খৃষ্টান মিশনারি ডাফ সাহেবের নিকট খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিল। ছেলের বাপ ইহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া হারিয়া গেল। হিন্দুসমাজ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত এক ঝাঁঝালো প্রবন্ধ লিখিলেন—"যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর তবে মিশনরীদিগের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর।"

এই আন্দোলনের ফলে 'হিন্দুহিতার্থী' বিদ্যালয় খোলা হইল। উহার জন্য একসভাতেই চল্লিশ হাজার টাকার চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত দেব উহার সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক হইলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি দেবেন্দ্রনাথ সংসার-ত্যাগী দণ্ডধারী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি সংসারে ছিলেন বটে কিন্তু সংসার তাঁহাতে ছিল না। তাঁহাতে ত্যাগ ও ভোগ দুই-ই পুরামাত্রায় ছিল। তাঁহার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ ছিল। নির্দোষ ইন্দ্রিয়সুখ হইতে কোন দিন নিজেকে কোনমতেই বঞ্চিত করিতে চাহিতেন না। কোন রকম শ্রীহীনতা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বেশভূষা ও আদব-কায়দার উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ী ভরিয়া উঠিয়া গম গম করিতে থাকিত। দেখিতাম গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া

সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোন ক্রুটী হয় এজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এ জন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।" দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যেকটী কাজ নিয়মে চলিত। কোন ক্রুটী তাঁহার কাজে হইবার জো ছিলনা।

দেবেন্দ্রনাথ 'মনের মধ্যে কোন জিনিষই ঝাপ্‌সা রাখিতে পারিতেন না' বলিয়াই—'তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন তাহার *প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন'* এবং *'এইজন্য কোন ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিষটা ঠিক কোথায় থাকিবে,* কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোন অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার সঙ্কল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না।'

দেবেন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। জমিদারীও তাঁহাকে দেখিতে হইত। কিন্তু তিনি সকল কার্যই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সম্পন্ন করিতেন। বৈষয়িক কাজকর্মেও যেন ঈশ্বরের সত্তায় নিজকে ডুবাইয়া রাখিতেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, তিনি হিসাবের খাতায় প্রথমেই একটী ধর্মপ্রসঙ্গ লিখিয়া রাখিয়াছেন।

যখন ব্রাহ্ম বিবাহ লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময় হিন্দু জাতীয়তারও জাগরণ হইল। রাজনারায়ণ বসু জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য উদ্যোগী হইলেন। স্বর্গীয় নবগোপাল

মিত্রের উদ্যোগে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে হিন্দুমেলার আয়োজন হইল। তাহাতে জাতীয় ব্যায়াম, স্বদেশীয় সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করা হইল। এই হিন্দুমেলা এদেশে স্বদেশ-প্রেমের প্রথম উদ্বোধন করে। স্বদেশী আন্দোলনের ইহাই উদ্যোগ পর্ব। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ে ঠাকুরবাড়ী স্বদেশীয় সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে এই সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণরূপে উহার পরিপোষণ করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় ও বাংলার নব জাগরণ

দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, সিপাহী বিদ্রোহ তখন একরকম নির্বাপিত হইয়াছে। 'সিপাহী বিদ্রোহের আগুন শীঘ্র নিভিয়া গেল বটে, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে তাহা একটা নূতন সার রাখিয়া গেল। এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই সময় হইতেই সুরু। সিপাহী বিদ্রোহের আগুনের পরিণাম-স্বরূপ সারেই তাহার ফলন।'

শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়,—সামাজিক, সাহিত্যিক ও ধর্ম্ম্য আন্দোলন—এক কথায় বাঙালী জীবনের স্ফূর্তির সকল দিকেই সিপাহী বিপ্লব একটা বিপুল অভ্যুদয়ের সূচনা করিল। ১৮৫১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহা রাজনৈতিক আন্দোলনের নীহারিকার অবস্থা। উহা হইতে ধীরে ধীরে একটী রাজনৈতিক আন্দোলন

জমিয়া উঠে। ইহার জন্য "হিন্দু পেট্রিয়ট" ও উহার সম্পাদক হরিশ মুখুয্যের দান অনেকখানি। এই সময়ে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে লিখিতে সুরু করেন। এই সময়েই আবার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক বাহির হইয়া দেশে তুমুল হুলুস্থূল উপস্থিত করে। হরিশ মুখুয্যের মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতা শক্তি যথেষ্ট কাজ করিয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও অপর দিকে মাইকেল মধুসূদন এবং দীনবন্ধু এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন ভাবের বন্যা বহাইয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অসম সাহসিক প্রচেষ্টা তখনকার বাঙালী সমাজে বিস্ফোরকের মত আচম্‌কা পড়িয়াছিল। তাঁহার 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকের' লেখা 'আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাসের মত দেশাচারের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, হৃদয়হীনতা পোড়াইয়া চলিয়াছে। এত বড় একটা বীর্য্য পৌরুষ ও মহত্ত্বের বাণী বাংলা সাহিত্যে আর কখনও শোনা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।' ইহার পরই কেশবচন্দ্র ও তাঁহার ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ সমাজ-সংস্কারে এক বিপুল আন্দোলন জাগাইয়া তোলেন। 'এইরূপে প্রায় সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে তিন চার বছরের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন, নূতন সাহিত্যের আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি একে একে উঠিয়া সমস্ত বাঙ্‌লা দেশকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়া তাহাকে সচল ও সচেতন করিয়া তুলিল। সমস্ত দেশ অনুভব করিল যে, তাহার মধ্যে একটা বড় যুগের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সেই যুগশক্তির বিচিত্র লীলা এই সকল আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।'

এই সবগুলি আন্দোলনের গোড়ায় প্রেরণা যোগাইয়াছে ব্রাহ্ম আন্দোলন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবর্তক হইলেও আন্দোলন জমাইয়া তুলিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাই ব্রাহ্ম সমাজে কেশবচন্দ্রের যোগদান একটী স্মরণীয় ঘটনা।

কেশবচন্দ্র কলুটোলার বিখ্যাত সেন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্রের মধ্যে দলপতির ভাব প্রবল ছিল এবং একদল যুবক তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁহাকে ঘিরিয়া এক নূতন জীবন গড়িতেছিল। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদলের যৌবনের প্রাচুর্য ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সমস্ত দিক্ দিয়া প্রাণ দান করিয়া তুলিল। বর্ষীয়ান্ দেবেন্দ্রনাথ ও যুবক কেশবচন্দ্রের মিলনে ব্রাহ্ম সমাজ সত্যই সেদিন বাংলার নবযুগের সূচনা করিল।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়, সঙ্গত সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ছোট ছোট বই এবং ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা প্রকাশ করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। এদিকে ব্যক্তিগত দিক্ দিয়া কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও পরিবারে একেবারে আপনার হইয়া গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের সুন্দর ও উজ্জ্বল মুখশ্রী দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ সঞ্চার করিত। অনেক সময় কেশবচন্দ্র সম্মুখে না থাকিলে দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান জমিয়া উঠিত না। কৌচের উপর নিজের পাশে বসাইয়া দেবেন্দ্রনাথ মাখন মিশ্রি খাইতেন, এক চামচ নিজে খাইতেন আর এক চামচ কেশবকে দিতেন। নৌকা ভ্রমণে যখন যাইতেন কেশবকে নিজের পাশে না শোয়াইলে তাঁহার সোয়াস্তি ছিল না। যখন কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথই তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের ছেলেরা কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতেন। এমন কি শোনা যাইত, দেবেন্দ্রনাথের সম্পত্তির এক অংশ কেশবচন্দ্রও পাইবেন। কেশবের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের নিবিড় প্রীতির সখ্য সম্বন্ধ বর্তমান ছিল। তাই তিনি এক চিঠিতে কেশবচন্দ্রের কথায় আবেগের সহিত লিখিয়াছিলেন—“যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা।”

যখন ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়েই বিচ্ছেদ আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে বিভক্ত করিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে যেমন প্রীতি ছিল, তেমনই তীব্র বিরোধ দেখা দিল।

এই বিরোধের কথা বুঝিতে হইলে দুই একটী বিষয় বলা আবশ্যক। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিগত বৈষম্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবতই রক্ষণশীল ছিলেন। সংরক্ষণ করিয়া সংস্কার সাধনই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু কেশবচন্দ্রের আদর্শ ছিল একেবারে আমূল সংস্কার বা বিপ্লব। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্যের দুঃসাহসিকতা জিনিষটা ছিলনা। যে দুঃসাহস প্রাচীনের সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নব নব পরীক্ষার পথে ধাবিত হয়, সেই দুঃসাহসের দুর্দমনীয় বিপুল বেগ বরং কেশবচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়, দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে নয়।

কেশবচন্দ্র ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং পরিশেষে আচার্যের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ ও দুর্দম কর্মশক্তি ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নবীন দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তিই তখন ব্রাহ্ম সমাজে খুব বেশী। ইহারা ধর্ম এবং সমাজসংস্কারে গতানুগতিক সকল গণ্ডী একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন। ইঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন বাক্যে ও কার্যে তাহাই করিয়া ছাড়িতেন। সমাজের প্রাচীন দল কিছুতেই ইহাদের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের কার্য-প্রণালী ও পরিচালন-ব্যবস্থার নানা ছোটখাট ব্যাপারে এই উভয় দলের মধ্যে কিছু কিছু গোলযোগ পাকাইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পৈতা ব্যাপারে সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তখন সমাজের তরুণ দলের অন্যতম নেতা। তিনিই নাকি প্রথম প্রশ্ন তোলেন, অপৌত্তলিক ব্রাহ্মগণ

পৌত্তলিকতার চিহ্ন যজ্ঞসূত্র কেন ধারণ করিবে? এই বিষয় লইয়া দুই দলে তুমুল মতভেদের সৃষ্টি হইল। সমাজের আচার্য বা উপাচার্যের আসনে কোন পৈতাধারী ব্রাহ্ম বসিতে পারিবেনা, ইহাই ছিল নবীন দলের অন্যতম মত। এইরূপে অগ্রসর দল ও অনগ্রসর দলে বিভেদ সুরু হইল। অবশেষে কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন পন্থিগণ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে আলাদা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে এইরূপে বিচ্ছেদ হইল বটে, কিন্তু উভয়ের জীবনে উভয়ের প্রভাব চিরদিন বহমান ছিল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ তখন হইতেই 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হইল। ইহার পরেও দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে এবং কেশবচন্দ্রের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই উভয় সমাজের মধ্যে যে পার্থক্যটী প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা এই। কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ উভয়েই ভক্তিপন্থী ছিলেন এবং সেই জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির একটা বন্যাধারা বহিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞান-প্রধান প্রকৃতি এমন করিয়া মত্ত হইতে পারিত না।

ইহার পর ব্রাহ্ম বিবাহ আন্দোলনে এই উভয় দলের সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বিবাহ যখন হিন্দু শাস্ত্র মতে যথার্থ সিদ্ধ নয়, তখন উহা রাজকীয় আইনে বৈধ হইবে কিনা ইহাই ছিল সন্দেহের বিষয়। কাজেই ব্রাহ্ম বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য গভর্নমেণ্টের একটী আইন পাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিলেন। কেশবচন্দ্র ইহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সরকার পক্ষ হইতে এই নিমিত্ত যে আইন বিধিবদ্ধ হইবার জন্য উপস্থাপিত হইল তাহাতে একটী প্রতিজ্ঞা-বিধি ছিল এই যে 'আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শী, শিখ কিংবা জৈন কোন ধর্মাবলম্বী নই,' এই কথাটী স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে জাত্যভিমানী রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ

প্রমুখের মনে তীব্র আঘাত দিয়াছিল। তাঁহারা উহার প্রতিবাদ ভীষণ ভাবে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র উহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি" এবং "The term Hindu does not include the Brahmo." রাজনারায়ণ বাবু এই কথায় সে দিন লিখিয়াছিলেন,—"যেদিন কেশববাবু বলিলেন আমি হিন্দু নই, সে দিন কি শোচনীয় দিবস! দুই ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈত্রিক নিবাসস্বরূপ হিন্দু সমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।" কিন্তু কেশবচন্দ্রের মনে ইহাই লক্ষ্য ছিল যে এই বিধিদ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদ হইবে এবং সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে সঙ্কর বিবাহের প্রচলন করিয়া এক ভারতীয় ভ্রাতৃ-মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। যাহা হউক, ১৮৭২ সালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং উহা উক্ত সালের তিন আইন নামে পরিচিত।

এই আইন পাশ হইলে, ইহার পর বৎসর দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দুই পুত্র সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে উপনয়ন সংস্কার করিয়া উপবীত দিলেন। অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেকে হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কার করা তাঁহার অন্তরে কোন রকমেই খাপ খাইত না। এই জন্য তিনি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, এক কালে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে তিনি নিজেই উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ খুব বেশি সামাজিক লোক ছিলেন না। সকলের সঙ্গে মাখামাখি ভাব তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সর্বদাই 'স্বতন্ত্র, সুদূর, সম্বৃত, সংযত।'

দেবেন্দ্রনাথের বাংলা রচনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। উহার সরসতা ও সৌন্দর্য সত্যই দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সৌষ্ঠবজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার আত্মজীবনী, তাঁহার প্রার্থনা ও

ব্যাখ্যান আজও সরল আন্তরিকতার জন্য অননুকরণীয় রহিয়াছে। তাঁহার নিজের কথা অনেক জায়গায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে একটী প্রার্থনার এক টুক্‌রা লিখিলাম। বাংলা দেশের জন্য তাঁহার মনে কি গভীর বেদনা ও দরদ ছিল তাহা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। —"হে পরমাত্মন্! আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই সকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই—ইহা নানা ক্লেশ, নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে—দিনরাত্রি ইহার ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এদেশকে উদ্ধার কর।"

শান্তিনিকেতন ও শেষ জীবন

১৮৭৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে বছর দশেক তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়াছেন—একেবারে পরিব্রাজকের মত। ইহার পর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, জ্ঞানের সাধনায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনা স্বভাবতঃ জ্ঞানপ্রধান হইলেও উহাতে রসের দিক্‌টার প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পথকে গ্রহণ করে নাই। এই সাধনায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিল দীৱান হাফেজ। শেষ বয়সে হাফেজের কবিতায় তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। বোধ হয় উপনিষদ্‌ও এমন করিয়া তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

দেবেন্দ্রনাথের শেষ বয়সের বন্ধু ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। সেকালের পার্সিপড়া রসিক মানুষটী সেতার বাজাইয়া গান গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিতেন। তাঁহার সারা মুখে আনন্দ ডগমগ করিত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিতেন শান্তি নিকেতনের বুলবুল। শ্রীকণ্ঠ

সিংহের বাড়ী ছিল রায়পুর। সেখানে একবার যাইবার পথে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করেন। তখন উহার নাম ছিল ভুবনডাঙ্গা। সেখানে থাকিত এক ডাকাতের দল। চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত ধূসর মাঠ। সবুজ রংএর আভাস মাত্র কোথাও নাই। উহারই মাঝখানে দুইটী প্রকাণ্ড ছাতিমগাছ ছিল। ডাকাতের দল ঐখানে নাকি মানুষ খুন করিত। এই বিষম ভয়ের জায়গাটী আশ্রম হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথের শেষ বয়সের বন্ধু যেমন শ্রীকণ্ঠ বাবু, তাঁহার শেষ বয়সের আশ্রয় তেমনি শান্তি নিকেতন আশ্রম। এই ছাতিম গাছের নীচে একটী বেদীতে বসিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তির" মধ্যে নিবিষ্ট হইতেন। তিনি অনুভব করিলেন, এই নির্জন স্থানটীর একটী বিশেষ আকর্ষণ আছে। তাই বোলপুরের মরুভূমিতে শান্তি নিকেতনের আশ্রম রচিত হইল। অন্য জায়গা হইতে মাটী আনাইয়া সেই মাটী শান্তিনিকেতনে ফেলিয়া সেখানে দেবেন্দ্রনাথ এক কানন রচনা করিলেন। গোলাপ, যুঁই, বেল, বকুল, মালতী, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছ ও লতা; আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ; শাল মহুয়া দেবদারু প্রভৃতি উন্নত বনস্পতির বীথিকা সেই কাননে রোপিত হইয়া দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। মরুভূমির মধ্যে ফুটিল ফুল, নামিল ছায়া, ছুটিল সৌরভ। সেখানে পাখীর দল আসিয়া উৎসব জমাইল।

১৮৭৩ সালে হিমালয়ে যাইবার পথে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। হিমালয়ে যাইয়া তাঁহারা ডালহৌসী পাহাড়ে বক্রোটায় ছিলেন। সেই সময়ের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক একদিন জানি না কত রাত্রে দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটী মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ

সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

"তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্তবেষ্টন হইতে বড় দুঃখের এই উদ্বোধন।"

এই সময়ে হিমালয় যাত্রাপথে একটী ঘটনা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"কোন একটী বড় ষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছে। টিকিট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কি একটা সন্দেহ করিল, কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল। উভয়ে আমাদের গাড়ীর দরজার কাছে উস্‌খুস্‌ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধ হয় স্বয়ং ষ্টেসন মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্‌ টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটীর বয়স কি বার বৎসরের অধিক নহে?" পিতা কহিলেন, "না।" তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশী হইয়াছিল। ষ্টেসন মাষ্টার কহিল, ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে। আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ব্যাগ হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল, তিনি সে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল। ষ্টেসন মাষ্টার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া গেল। টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।"

১৮৭৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের পত্নী সারদা দেবী পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব দিন তিনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সারদা দেবী শুধু বলিলেন, "আমি তবে চল্লেম।" দেবেন্দ্রনাথ নিজে শ্মশানশয্যা সাজাইয়া বিদায় দিলেন, "ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।" দেবেন্দ্রনাথ এই শোক অবিচলিত ভাবে সহ্য করেন। ইহার পর আবার কয়েকবার বক্রোটা শিখরে বেড়াইয়াছেন। তারপর এক সময়ে চীন দেশ বেড়াইয়া আসিলেন। অনেক সময় শান্তিনিকেতনে আশ্রমে তিনি নির্জনে যাপন করিতেন। ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ হইতে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' বিচ্ছিন্ন হয়। এই নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ সহানুভূতি জানাইয়া আশীর্বাদ লিপি পাঠাইয়াছিলেন। এই সমাজের উদ্যোক্তা আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সহিত শেষ জীবনে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভাব হইয়াছিল। পরলোকগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সহচর ছিলেন।

শেষবয়সে দেবেন্দ্রনাথ অনেকদিন চুঁচুড়ায় ছিলেন। কিছুদিন বোম্বাই, দার্জিলিংও ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছেন। তারপর শরীর দুর্বল হইয়া পড়ায় তিনি কলিকাতায় থাকিতেন। পার্ক ষ্ট্রীটে তাঁহার জন্য এক বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। সেখানে প্রায় ১০ বৎসর ছিলেন। তারপর জোড়াসাঁকোর নিজেদের বাড়ীতেই মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন। পার্ক ষ্ট্রীটে থাকিতে ১৮৮৭ সালে তিনি শান্তি নিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের জন্য "ট্রাষ্ট ডিড্" করিয়া উৎসর্গ করিয়া যান। ইহার ট্রাষ্ট ডিড্ রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাষ্ট ডিড-এর অনুকরণে করা হয়। শুধু ইহাকে একটী সাধনার আশ্রম না করিয়া এখানে একটী ব্রহ্ম বিদ্যালয় ও ভাল গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা সংকল্পিত করিয়া যান।

পিতার সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথ এই সংকল্পকে রূপ দিয়াছেন। তাই আজ শান্তিনিকেতন পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র এবং ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার পুণ্যতীর্থ। শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের ভরসা মহর্ষির ছিল। কেহ নৈরাশ্য প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "তোমরা কিছু ভেব না। ওখানকার জন্য কোন ভয় নাই। আমি ওখানে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্‌কে প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।" ট্রাষ্ট ডিডের বিধি অনুসারে প্রতি বছর ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথের পুণ্য দীক্ষা দিবসে শান্তিনিকেতনে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। তিনি অধিকাংশ সময় কৌচে হেলান দিয়া বসিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি কেবলই বলিতেন, "আমি বাড়ী যাব, আমি বাড়ী যাব।" সে সময়ও তিনি নিয়মিত ব্রহ্ম উপাসনা করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব দিনেও তিনি ভোরে উঠিয়া চীৎকার করিতেছেন, "আমাকে পূবমুখো করিয়া দাও, আমাকে পূবমুখো করিয়া দাও। আমার উপাসনার সময় হ'ল।"

১৯০৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তভাবে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

কলিকাতার কলুটোলার সেন পরিবার অতি বিখ্যাত। কেশবচন্দ্র এই পরিবারে ১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্যারীমোহন সেন এবং পিতামহ বিখ্যাত রামকমল সেন। রামকমল সেন আট টাকা বেতনে ছাপাখানার সামান্য কর্মচারিরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরিশেষে তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানীপদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়া বিত্তশালী হওয়াতেই তাঁহার কৃতিত্ব নয়। তিনি সেকালে একজন পরম বিদ্বান্ লোক ছিলেন এবং নানা প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্র উভয়েই পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

কেশবচন্দ্র দেখিতে খুব সুন্দর ছিলেন এবং বাল্যকালে আবদারে ছেলে ছিলেন। পাঁচ বছরের সময় তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে জুনিয়র শ্রেণীতে পড়িবার সময় কেশবচন্দ্র প্রায় প্রতি বৎসরই পারিতোষিক পাইতেন। ঊর্ধ্বতন শ্রেণীতে পড়িবার সময় গণিতশাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত বীতরাগ হন এবং অবশেষে কলেজে নিয়মিত পড়া হইতে বিরত হন। ইহার পর তিনি দুই বছর গণিত ব্যতীত কলেজের অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল।

কেশবচন্দ্রের বয়স যখন আঠার বছর, সেই সময়েই তাঁহার ধর্মজীবন শুরু হয়। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্মজীবনের সঞ্চার হয়, কিন্তু চতুর্দশ বৎসরেই মৎস্যভক্ষণ ত্যাগ করিলাম। তখনই বৈরাগ্যের প্রথম সঞ্চার হইল।

যত প্রকার সুখভোগ, যৌবনে তৎসমুদয় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম আমোদকে বলিলাম, 'তুই শয়তান, তুই পাপ।' বিলাসকে বলিলাম, "তুই নরক; যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।

এইরূপ যখন তাঁহার মনের অবস্থা, সেই সময়েই কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের আনন্দ-উৎসব তাঁহার মনের পরিবর্তন করিতে পারিল না। জীবনের এই বৈরাগ্যময় ঊষর জীবনে তাঁহার সহায় ছিল একমাত্র প্রার্থনা। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের সেই ঊষাকালে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। ধর্ম কি জানি না ও ধর্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই; গুরু কে কেহ বলিয়া দেয় নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই, জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চারিত হইত।"

"এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি, আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই। কি কথার বল, কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয়, প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়। পাপকে ঘুসি দেখাইতাম আর প্রার্থনা করিতাম।"

কেশবচন্দ্র যুবকদের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত করিবার জন্য ১৮৫৭ সালে 'গুড্‌উইল ফ্রেটারনিটি' নামে একটি সভা স্থাপন করেন পৃথিবীতে এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাঁহারা বাল্যকাল হইতে নেতৃত্ব করিবার জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র এইরূপ একজন ছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুদের সহিত পরম উৎসাহে ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে য়ুরোপীয় আদর্শে

প্রথম ধাক্কায় আমাদের সমাজে ও জীবনে নীতি ও ধর্ম শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের এই চেষ্টা এই জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা তখন পূর্ণমাত্রায়।

ইহার পরই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরম আগ্রহে এই ধর্মোৎসাহী সৌম্যদর্শন যুবককে গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের প্রবেশ শুধু ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে নহে, পরন্তু বাংলার জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেশবচন্দ্রের আগমনে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন শুধু ধর্মান্দোলনে পর্যবসিত রহিল না, উহা বাঙালীর জীবনের দুই কূল ছাপাইয়া সমাজ, শিক্ষা ও লোকসেবায় বাঙালীকে সজাগ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন মুখ্যত ধর্মান্দোলন হইলেও কেশবচন্দ্রের দুর্দম কর্মস্পৃহা ও বহুমুখী প্রতিভায় উহা সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ক ও জনহিতকর আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইত। ইহার কয়েক মাস পরেই কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া সিংহল যাত্রা করেন। মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সঙ্গে ছিলেন। তিনি কেশবের সহপাঠী ছিলেন। কেশবচন্দ্রকে বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতসারে এই ভ্রমণ-যাত্রায় যাইতে হইয়াছিল। মহর্ষির সহিত ঘনিষ্ঠ সহবাস কেশবচন্দ্রের ধর্মশিক্ষার যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।

অভিভাবকদের অনুরোধে ১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্র বেঙ্গল ব্যাঙ্কের এক কেরাণী-পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই কার্য তিনি

দেড় বৎসরের অধিক কাল করেন নাই। এই কাজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র বিপুল উৎসাহে ধর্মপ্রচার ব্রতে জীবন ঢালিয়া দিলেন। তিনি মাসে মাসে কতকগুলি পুস্তিকা প্রচার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের প্রচার উপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতা ও মিশনরীকে পরাজয় এই সময়ে উল্লেখযোগ্য। এদিকে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গত সভার মধ্য দিয়া যুবকদের মধ্যে প্রবল ধর্মভাব জাগাইয়া তুলিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মহর্ষির সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রায় এক ঘণ্টায় শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের উপদেশের শেষ কোথায়? বক্তৃতাকালে কখনও চীৎকার করিয়া বলিতেন—"তোমরা ধর্মেতে পাগল হইবে না? দুইজনও পাগল হইয়া সংসার ছাড়িবে না?" শিখদের ধর্মালোচনা ও ধর্মপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গত-সভা। উহার নামানুকরণে ব্রাহ্মযুবকদের এই অধ্যাত্ম-গোষ্ঠীর নামও সঙ্গতসভা রাখা হইয়াছিল। সঙ্গতসভার আলোচিত বিষয়গুলি পরে 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' নামে কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন। উহার এক স্থানে উপবীত পরিত্যাগ করা কর্তব্য এই কথাটি লিখা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ উহা পাঠ করিয়া আপনার উপবীতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তবে আর ইহা কেন? এই বলিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

সঙ্গতসভার সভ্যগণ কিরূপ সত্যব্রতী ছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর 'বোধ হয়' 'হইতে পারে' 'সম্ভব' ইত্যাদি না বলিয়া কখনও কথা বলিতেন না। একবার এক ব্যাঙ্কের কর্মচারীকে উপরওয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন, হিসাব ঠিক হইয়াছে ত? কর্মচারীটি সঙ্গতসভার সভ্য, বলিলেন—বোধ হয় ঠিক হইয়াছে।

বোধ হয় ঠিক হইয়াছে কি? ঠিক করিয়া বল।

হাঁ, প্রায় ঠিক। অনেক জেরা করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে 'সম্ভব' 'বোধ হয়' ছাড়া উত্তর পাওয়া যায় নাই।

উত্তর-পশ্চিম দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণে ও ত্রিবেণী, হালিসহর প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচার, পুস্তক প্রণয়ন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কাজের জন্য 'ব্রাহ্মবন্ধু-সভার' প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৬১ সালে আগষ্ট মাসে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক ব্রাহ্ম সমাজের একখানি ইংরেজী পত্রিকা বাহির হয়। 'কলিকাতা কালেজ' নামে একটি বিদ্যালয়ও কেশবচন্দ্র এই সময়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬২ সালে ১লা বৈশাখ ব্রাহ্ম সমাজপতি ও প্রধান আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে অভিষিক্ত করেন। এই উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র নিজের পত্নীকে মহর্ষির গৃহে লইয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। নিষ্ঠাবান্ সেন-পরিবারের কুলবধূ কোন দিন বাড়ীর বাহির হন নাই। আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কেশবচন্দ্র পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'যদি আমার অনুবর্তিনী হইতে চাও, এই বেলা অনুবর্তিনী হও। এই সময়। অন্যথা আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।' লজ্জাশীলা কুলবধূ গুরুজনদের তিরস্কার শুনিতে শুনিতে স্বামীর সহিত বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। দ্বারদেশ রুদ্ধ ছিল। অবশেষে উহারই নিম্নস্থ ক্ষুদ্র দরজা দিয়া উভয়ে বাহির হইলেন। মহর্ষির গৃহে কেশবচন্দ্র পত্নীসহ অনেক দিন বাস করেন। তাঁহাদের গৃহে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ঠাকুর বাড়ীতে উভয়ে পরম আদরে ছিলেন। তারপর যখন বাড়ীতে চলিয়া যান, মহর্ষি তখন কেশবচন্দ্রের পত্নীকে নানা আভরণ ও উপঢৌকন দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

আচার্য হইবার পর কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে প্রমুখের লেখার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। এই সময়ে কয়েকজন প্রচারকসহ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাই

গমন করেন এবং সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। এই প্রচার কার্য হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে বিভেদের কালো মেঘ ঘনায়িত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ও উপবীতত্যাগী আচার্য নিয়োগ কেশবচন্দ্রের প্রগতি-প্রয়াসী মনের কার্য। মহর্ষি যদিও স্বভাবতঃ রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের যৌবনোচিত কর্মোদ্যমের মুখে তিনি বাধা দেন নাই। এইরূপে ধীরে ধীরে প্রাচীন সংরক্ষণপ্রয়াসী দল ও নবীন উন্নতিপ্রয়াসী দলের মধ্যে বিরোধ জমিয়া উঠিল। ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্য এবং ধূমায়িত বিরোধ মিটাইবার জন্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-প্রতিনিধি সভা নামক সকল ব্রাহ্মদের এক সম্মিলিত সভা আহ্বান করেন। মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র উভয়েই ইহাতে বক্তৃতা ও উপদেশ দেন। কিন্তু ইহার পরেই উভয় দলে বিভেদ অনতিক্রমণীয় হইয়া দাঁড়াইল। কেশবচন্দ্রের পক্ষীয়গণ ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা বাহির করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী হিসাবে সকল সম্পত্তি নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার প্রমুখ পদত্যাগ করিলেন। ইহার পর আর একত্র থাকা সম্ভব হইল না। বিশেষতঃ উপবীতের সমস্যাই প্রত্যাক্ষভাবে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তুলিল। কোনমতেই যখন মিলন হইল না, তখন কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ পৃথক সমাজ সংস্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না। এইরূপে ১৮৬৬ সালে ১১ই নবেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইল।

ইহার পর কেশবচন্দ্র পূর্ণ উদ্যমে প্রচার কার্য চালাইলেন। সমগ্র উত্তর-ভারত ঘুরিয়া ব্রাহ্মধর্মের বার্তা প্রচার করিলেন। ভাগলপুর, পাটনা, কাণপুর, লাহোর, দিল্লী, অমৃতসর, মুঙ্গের প্রভৃতি সহরে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই কেশবচন্দ্র একবার পূর্ববঙ্গে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ও অঘোরনাথ গুপ্তের সঙ্গে একবার ঘুরিয়া গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময় অনলবর্ষী বক্তৃতায় সর্বত্রই একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজ (মহর্ষির পরিচালিত) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বক্তৃতা, প্রচার ও উপাসনার মধ্যদিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেই কালে অনেকের জীবনেই কি রকম যেন শুষ্কতা আসিয়া পড়িয়াছিল। নবধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সরসতা আনিবার জন্য কেশবচন্দ্র ভক্তিভাবের সঞ্চার করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-বংশের ছেলে, তিনি খোলকীর্তন প্রবর্তন করিলেন। নূতন নূতন গান রচিত হইল। ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বন্যা ছুটিল। এই সময়ের কথায় কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য।...যতদিন অন্তরে বৈষ্ণব ভাব ছিল না, ঈশ্বর ততদিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দিতেন। ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে কিরূপে ও কেমন গুপ্তভাবে একজন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তির ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্তন হইল, বুঝিলাম যাহা না থাকে তাহাও পাওয়া যায়। এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে, আর বলিতে পারিনা, এখন ভক্তি অধিক কি বিবেক অধিক; আনন্দ অধিক কি তপস্যা অধিক; সুখ অধিক কি কঠোর ধর্মশাসন অধিক। আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না, শান্তি, আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্শ্বে রাখিলাম।"

এই ভক্তিধারায় কেশবচন্দ্র সারা দেশকে সিক্ত করিয়া তুলিলেন। মুঙ্গের সহরেই ইহার আতিশয্য হইয়াছিল। সহরে বক্তৃতা উপাসনা ও কীর্তনের ধূম পড়িয়া গেল। কেশবচন্দ্রকে ঘিরিয়া তুমুল কীর্তন ও নৃত্য চলিল, তাঁহার পায়ের ধূলির জন্য ভক্তদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িল। এমন কি অনেক ভক্ত কেশবচন্দ্রের পদ ধৌত করিয়া

নিজের স্ত্রীর চুলদ্বারা মুছিয়া দিলেন। অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যাইতে লাগিল। এসকল ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সহকর্মিগণের মধ্যে তীব্র আন্দোলন জাগিল। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ব্রাহ্মগণ নরপূজার অপবাদ কেশবচন্দ্রের উপর দিলেন। সকলের মধ্যেই বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল।

যাহা হোক কিছুদিন পর এই আন্দোলন প্রশমিত হইল। এদিকে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রচার কার্যও নানা স্থানে চলিতেছিল। অতঃপর ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের বার্তা প্রচারের জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তিনি সেখানে প্রায় আটমাস ছিলেন এবং প্রায় ষাটটি বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করেন। ইংলণ্ডে তিনি বিশেষ সম্বর্ধনা ও সম্মাননা পাইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি ইংলণ্ডীয় লোকের চিত্তে শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

বিদেশ হইতে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র 'ভারত সংস্কার-সভা' স্থাপন করেন। সর্ববিধ সামাজিক ও লোক-কল্যাণ সাধন ইহার লক্ষ্য ছিল।

কেশবচন্দ্র এই সভা হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'সুলভ সমাচার' নামে একখানি এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। এদেশে সস্তায় সংবাদপত্র প্রচারে ইহাই অগ্রণী। এক পয়সা দামের পত্রিকা যে বাহির হইতে পারে, তখন কেহ তাহা ভাবিতে পারিত না। সহজ বাংলায় প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য লেখা হইত। ইহা ধনী গরীব সকলে সাদরে পড়িত। ইহার ফলে অনেকে কাগজ পড়িতে শিখিল। কেশবচন্দ্র এই পত্রিকায় শ্রমিকদের উন্নতির জন্যও লিখিতেন। তাঁহার এই সমস্ত লেখা, বর্তমানের শ্রমিক নেতাদের উক্তি বলিয়া ভ্রম হয়। বাস্তবিক সব দিক্ দিয়াই কেশবচন্দ্র অগ্রগতির নেতা ছিলেন। এই ভারত সংস্কার সভার উদ্যোগে সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পর্কীয় দরজীর কাজ,

সূত্রধরের কাজ, ঘড়ী মেরামত, খোদাই প্রভৃতি কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুরাপান ও মাদক নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, দাতব্য কার্য ইত্যাদি এই সভার অন্যতম কার্য ছিল। ইহার সমসাময়িক কালেই 'ইণ্ডিয়ান মিরার' দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইল। এদেশে ইংরেজী দৈনিক ইহার পূর্বে কোন ভারতীয় কর্তৃক সম্পাদিত হয় নাই।

এই সময়ের আর একটি আন্দোলন ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিষয়ক আইন লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্নি, শালগ্রাম ও কুশণ্ডিকা বিহীন ব্রাহ্ম বিবাহ যাহাতে আইনের নিকট গ্রাহ্য হয়, সেই জন্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম বিবাহ-প্রথা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু এই আইনটি এমন রূপান্তরিত ভাবে বিধিবদ্ধ হইল যে, কিছুমাত্র জাতীয়তাবোধ আছে এমন লোকও এই আইনটি সম্মানের সহিত মানিয়া লইতে দ্বিধা করিবে। ইহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাই লইয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের সহিত কেশবচন্দ্রের তুমুল বিরোধ উপস্থিত হইল। আমাদের দেশেও এই বিবাহ আন্দোলনের ফলেই হিন্দুসমাজে প্রবল জাতীয় ও সামাজিক আবর্ত উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বিবাহের এই আইন ১৮৭২ সালের ৩ আইন নামে পরিচিত।

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্রের 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা এক নূতন ব্যাপার। কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবারকে লইয়া একত্র বাস করিয়া বিশুদ্ধ জীবনযাপন ও সাধক করার জন্য বেলঘরিয়া উদ্যানে 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র সপরিবারে এখানে আশ্রয় লন। এই আশ্রম পরে কাকুড়গাছী উদ্যানে এবং সর্বশেষ গোলদীঘির দক্ষিণে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। একই মনোবৃত্তি-সম্পন্ন পরিবার না হইলে একত্র বসবাস অনেক সময়েই বিষম অনর্থের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও এই জন্য কেশবচন্দ্রকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ভুগিতে হইয়াছিল।

এখন হইতে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক নূতন সাধনা আরম্ভ হইল। নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ও সাধন-প্রণালীর মধ্যদিয়া কেশবচন্দ্রের জীবন-সাধনা অগ্রসর হইতে লাগিল। বৈরাগ্য সাধন এই সময়ের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। বেলঘরিয়ার উদ্যানে 'তপোবন' স্থাপিত হইল। সেখানে কুটীর নির্মাণ করিয়া স্বপাক আহার, নির্জন সাধনা এবং মিলিত উপাসনায় কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের তপস্যা চলিতেছিল। এই উদ্যানে থাকিতেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরমহংস রামকৃষ্ণের পরিচয় হয়। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ছিল। ইহার পূর্বেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ একবার ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া কেশবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই লোকটার ফাত্‌না ডুবেছে।" তখনও তিনি কেশবচন্দ্রকে কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না। এই পরিচয়ে কেশবচন্দ্র পরমহংসের ভক্তিভাবে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই দুই মহাপুরুষের মিলন এক শুভ সংযোগ।

ব্রাহ্মসমাজে যে ভক্তি ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা দিল, তাহার প্রধান সহায় ছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণ। "তিনি বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া নৃত্য কীর্তন করেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা কেশবচন্দ্র যাহা করিতেন, তাহা ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত যোগের ফল, একথা অনেকেই জানেন। ব্রাহ্মধর্ম পূর্বে কঠোর নীরস ছিল, এখন তাহা সরস ও অত্যন্ত সরল হইল।"

নির্জন সাধনায় ব্রতী হইয়া কেশবচন্দ্র সংসার ও সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। বস্তুতঃ লোকসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একান্ত বিবিক্তসেবী হওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বহুজনকে লইয়াই ছিল কেশবচন্দ্রের সাধনা। তাই এসময়েও তাঁহাকে প্রচারকার্যে ও বক্তৃতা উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিতে হইয়াছে। ইহার পর মোড়পুকুরের একটি উদ্যান কিনিয়া 'সাধন

কানন' নামে এক তপস্যাক্ষেত্র রচনা করেন। এই স্থানে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সহ যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্যের সাধনা করেন।

ইহার পর কেশবচন্দ্র নিজের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এক বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহাতেই বসবাস করিতে থাকেন। উহার নাম রাখিয়াছিলেন 'কমল কুটীর'।

১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজ-কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রাহ্ম-বিধি যথাযথ অনুসৃত হয় নাই।

এই বিবাহে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। শিবচন্দ্র দেব, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রকে সম্পাদক পদ হইতে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রতিবাদ করিলেন। এদিকে কেশবচন্দ্রের অনেক সাধন-পদ্ধতি লোকের নিকট দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ তাঁহার খৃস্টীয় ভাবের আতিশয্য অনেকের নিকটই বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। এই সকল কারণ একত্র হইয়া অবশেষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া দিল। কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৮৭২ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশবচন্দ্রের সমাজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ নামে ইহার পর পরিচিত হইল। নববিধানের অন্যতম বিশেষত্ব এই দেখা দিল যে, কেশবচন্দ্র ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি সকল ধর্ম্মপ্রচারকদের মত ও পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইলেন। বিশেষ ভাবে ঈশার ভাবই তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল সবচেয়ে বেশী। এই সময়ে তাঁহার সাধনাও অনুষ্ঠান-বহুল হইয়া পড়ে। এমন কি গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানদের নানা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারও তিনি জীবনে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জর্ডনের জলে অভিষেক, খ্রীষ্টের রক্তমাংস বলিয়া অন্নজল গ্রহণ ইত্যাদিও সেকালের অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল।

কেশবের সাধন-পদ্ধতির আর একটি কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা মাতৃভাব। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে 'মা মা' বলিয়া ডাকিতেন, প্রার্থনা করিতেন। ভক্তিভাবের ইহা আর এক অভিব্যক্তি।

কেশবচন্দ্র চাহিয়াছিলেন, মহামানবের এক মিলনক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে। এদিক্ দিয়া তাঁহাকে জাতিপুঞ্জের অগ্রদূত বলা যায়। ৮০ বৎসর পূর্বে একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—

"এস, আমরা এক ঈশ্বর, এক সমাজ, এক সত্যে আবদ্ধ হই ; সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক করিয়া ফেলি।...বহু জাতি, বহু সম্প্রদায়, বহু মতের মধ্যে এরূপ একতা সম্ভব। সকলে মিলিত হইয়া একটি শরীর হও। আমি আমার সম্মুখে সেই জাতিসম্মেলনের ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি, যাহা একদিন অতি সুন্দর একতা সম্পাদন এবং সমস্ত শত্রুতা বিনাশ করিবে।" (Asia's message to Europe).

অনবরত পরিশ্রমে কেশবচন্দ্রের শরীর ও স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রমাগত জীবনব্যাপী পরিশ্রমে জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই সময়ে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দার্জিলিং সিমলা প্রভৃতি স্থানে কিছু দিন বেড়াইলেন। কিন্তু শরীর আর ভাল হইল না। শেষকালে তিনি কলিকাতায় কমলকুটীরে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পরলোকের যাত্রী কেশবচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মহর্ষির সঙ্গে পরম অন্তরঙ্গভাবে বিদায় লইলেন। কে জানিত ইহাই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহাপুরুষদের শেষ বিদায়।

১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী কেশবচন্দ্র মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সেদিন বুধবার। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সন্ধ্যাকালে উপাসনা ও প্রার্থনা হইতেছিল। প্রধানাচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদীতে আসীন। মধুর সঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ শেষ হইল। মহর্ষির প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রোতাদের আর্দ্র করিয়া তুলিল।

এই দিনের উপদেশ শুনিয়া এক নবীন যুবকের মনে কি ভাব হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন।—"এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্বকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হইল। এতদিন যে ইষ্টদেবতার পূজা করি নাই তজ্জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীর গলদ্‌ঘর্ম ও কম্পিত হইতে লাগিল। এইমাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ, প্রভো আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে রাখ, আমি আর কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।" তখনই তিনি মনে মনে মহর্ষিকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইলেন।

এই যুবকই ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর আগমনের প্রাক্কালে যিনি বাংলা দেশের তার্কিকতা ও প্রাণহীন আচারনিষ্ঠার বিরুদ্ধে ভক্তির বন্যা ছুটাইয়াছিলেন, সেই ভক্তবীর অদ্বৈত আচার্যের পুণ্য বংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ। ১৮৪১ সালের ২রা আগষ্ট নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্তী দহকুল গ্রামে মাতুলালয়ে বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামী পরম নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জননী অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন।

বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণ চঞ্চল ও একগুঁয়ে ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি প্রথমে পড়েন। পরে শান্তিপুরের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর তিনি কলিকাতা যাইয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তাঁহার বাল্যবন্ধু অঘোরনাথ এই সঙ্গেই ভর্তি হইলেন। এই সময়ে কলিকাতায় নানা প্রকার আন্দোলন মাথা গজাইয়া উঠিয়াছে। "১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব, এবং মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।"

এই সময়ে ছাত্রদের যথেচ্ছাচারিতার একশেষ হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ এইকালের প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন নাই, তাঁহার জীবনে একটা ধর্মপিপাসা জাগ্রত হইয়াছিল। এক সময়ে তাঁহাকে কলিকাতায় আর্থিক অভাবে বড়ই কষ্টে দিন কাটাইতে হইয়াছে। এমন দিনও গিয়াছে যখন দুই চারিদিন অভুক্ত অবস্থায় রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এই সময়েই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে গতায়াত শুরু করিলেন এবং হৃদয়ের শান্তি লাভ করিলেন। প্রথমেই সেকথা বলিয়াছি।

সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়িয়া বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ স্থাপন হয় এবং তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধু অঘোরনাথের সহিত মহর্ষির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ স্বভাবতঃ প্রগতিশীল ছিলেন। শান্তিপুরের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব গোস্বামী কিছুদিনের মধ্যেই উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম ও নবীন

দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইলেন। সে সময়ে এক রামতনু লাহিড়ী ব্যতীত কখনও অন্য কেহ উপবীত ত্যাগ করেন নাই।

এই সময়ে গোস্বামী মহাশয় কিরূপ ভাবে ধীরে ধীরে সকল সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটী স্মৃতি শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় অমর হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালেই ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তিনু চাটুয্যের বাড়ী থাকিতেন। একদিন একজন আসিয়া বলিল 'ওরে, বিজয় গোসাই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হ'য়েছে, চল তাঁকে দেখ্‌তে যাই। আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইলে বিদ্রূপকারী বন্ধুগণের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আমি তথায় রহিলাম। বিজয়বাবু আমার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে আমরা দুই বন্ধুতে যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ভোজন-পাত্র দেখিয়া আমি একে-বারে অবাক্ হইলাম। উহা আর কিছুই নয়, মেটে সানুক। আমি বলিলাম, 'ও বিজয়, একি? এ যে মেটে সানুক।' তিনি বলিলেন, 'যাও কাঁসাতে আর মাটিতে প্রভেদ কি?' ইহার পর একজন ঝিকে ভাত নিয়া আসিতে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'একি? বামনের জাত মারলে?' তিনি বলিলেন, 'ও কি? জাত্ টাত্ আবার কি? ও সব কিছু নয়। এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না?'

এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গত সভার একজন উৎসাহী সভ্যরূপে পরিগণিত হইলেন। উভয়েই প্রগতি-প্রয়াসী ছিলেন, কাজেই এই মিলন শুভকরই হইল।

উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হওয়াতে বিজয়কৃষ্ণের উপর তাঁহার গ্রামবাসীর অত্যাচারের সীমা রহিল না। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কত লোকে কত নিন্দা অপযশ ঘোষণা করিয়াছিলেন, গ্রামের লোকেরা এতদূর খড়্গহস্ত হইয়াছিল যে, আমাকে কেবল সমাজচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিবার জন্য আমার গায়ে রাব গুড় লেপিয়া বোল্‌তা লাগাইয়া দিয়াছিল।"

শান্তিপুরের গোস্বামীগণ বিজয়কৃষ্ণকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। রাস্তায় বাহির হইলে কেহ গালি দিত, কেহ তাঁহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিত, থুথু দিত, অথচ পরবর্তী কালে শান্তিপুরের গোস্বামীগণই বিজয়কৃষ্ণকে পরম শ্রদ্ধাভক্তি করিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ ইহার পর সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন। সেই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য নিজেকে যথাবিধি শিক্ষিত করিয়া লয়েন। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ব্রতী হইলেন। এই সময়ে যশোহর জেলার বাগ-আঁচরা গ্রামে তাঁহার প্রচার-কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে গ্রামে শুধু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, জ্ঞান বিস্তারের জন্য স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, ধর্ম সাধনের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ, চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। এক কথায় গোস্বামী মহাশয়ের মঙ্গল স্পর্শে সারাটি গাঁয়ের চেহারা যেন ফিরিয়া গিয়াছিল।

এই গ্রামেরই একজন বিজয়কৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন তবে ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্যগণ উপবীতধারী কেন? কথাটি গোস্বামী মহাশয়ের মনে লাগিল ইহার ফলেই ব্রাহ্মসমাজে উপবীত আন্দোলন উপস্থিত হইল আদি সমাজে উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য বিজয়কৃষ্ণ নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতে নবীন ও প্রাচীন দলে বিরোধ ঘনাইয়া আসিতেছিল। নবীন দলের উপবীত ত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, প্রভৃতি সংস্কার-প্রচেষ্টায় প্রাচীনগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এই

সময়ে একটী ঘটনায় উভয় দলে বিরোধ গাঢ় হইয়া উঠিল। ১৮৬৪ সালে আশ্বিনের ঝড়ে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির ভগ্ন হওয়াতে কিছুদিন মহর্ষির বাড়ীতেই উপাসনা হয়। ঝড়ের পরবর্তী বুধবারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে উপবীতধারী আচার্য উপাসনা করেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপস্থিত হইবার পূর্বেই উপাসনা আরম্ভ হয়। এই ঘটনায় গোস্বামী মহাশয় আর ঘরে ঢুকিলেন না, তিনি দুই বাহু বিস্তার করিয়া সকলকে উপবীতধারী আচার্যের উপাসনায় যোগদান করিতে নিষেধ করেন এবং অবশেষে বন্ধুগণ সহ অন্যত্র যাইয়া উপাসনা করেন।

এই বিবাদের ফলেই অবশেষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেকথা পূর্বেই লিখিয়াছি। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ও বিজয়কৃষ্ণের সাহচর্যে এই নূতন ব্রাহ্মগোষ্ঠী সর্বপ্রকার সংস্কার ও প্রচারকার্যে ব্রতী হইলেন। এই সময় তরুণদলের পক্ষে বড় দুর্দিন ছিল। চারিদিকে অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া ইঁহাদের অগ্রসর হইতে হইয়াছে। যখন কলিকাতায় ঘোর মতভেদের ঝড় বহিয়া চলিতেছিল, সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয় প্রচার কার্যে ঢাকায় আসিলেন। এই সময় হইতে ঢাকার সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগ স্থাপিত হইল।

১৮৬৪ সালে গোস্বামী মহাশয় সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা আসিলেন। এই সময়ে অনেক কষ্টে তাঁহাদের জীবন যাত্রা চলিত। ৺ব্রজসুন্দর মিত্রের আর্মানীটোলার বাড়ীতে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। মিত্র মহাশয় এস্থানের ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনে অগ্রণী ছিলেন। ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, বরিশাল ও মফঃস্বলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। প্রচারের জন্য তিনি প্রথমে কোঁন অর্থ গ্রহণ করেন নাই। নিজে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া যে সামান্য-কিছু রোজগার করিতেন, তাহাতেই কোন রকমে সংসার চালাইতেন। সাত শত ঘর শিষ্য ত্যাগ করিয়া এরূপ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার মহত্ত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে কেশবচন্দ্রও ঢাকা আগমন করেন। বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও কেশবচন্দ্র এক সঙ্গে থাকিতেন, কোন চাকর না পাওয়াতে নিজেরাই রান্না করিয়া খাইতেন। ইহাদের প্রচারের ফলে সমস্ত পূর্ববঙ্গ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কারও প্রবল বেগে চলিল।

অনবরত প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং চারিদিকের বিরুদ্ধতার জন্য গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে বড় অশান্তি বোধ করিতেছিলেন। কলিকাতার আবহাওয়া তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শান্তি লাভের জন্য তিনি শান্তিপুরে গেলেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধকদের সংস্পর্শে তাঁহার মনে ভক্তিভাব জাগিল। চৈতন্য চরিতামৃত পাঠে তাঁহার হৃদয় সরস হইল। একদিন পূর্ণিমা রাত্রে গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে দেখিতে ভক্তি ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে সরসতা আনিবার জন্য খোল কীর্তন প্রবর্তনে উদ্যোগী হইলেন। নিজেই বৈষ্ণব কীর্তনের অনুরূপ ব্রাহ্মকীর্তন রচনা করিয়া ভক্তি ধারার বন্যা ছুটাইলেন। ১২৭৪ সনে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম ব্রহ্মোৎসব হয়। এই উপলক্ষে অহোরাত্র কীর্তন চলিয়াছিল। সেদিন 'পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা' হইয়াছিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি প্রবল। মুঙ্গের কেশবচন্দ্র একরূপ অবতারের মত পূজিত হন। বিজয়কৃষ্ণ ইহার প্রতিবাদ করেন। একথা পূর্বে লিখিয়াছি।

ইহার পর বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা ও পূর্বোত্তর বঙ্গের অনেক স্থানে প্রচার কার্য করেন। কত কষ্ট, কত নির্যাতন মাথা পাতিয়া লইয়া সে সময়ে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, ভাবিয়া অবাক্ হই। ১২৭৬ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের গৃহপ্রবেশ সমারোহে সম্পন্ন হয়।

কেশবচন্দ্র যখন ভারত সংস্কার সভা ও ভারত আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন, বিজয়কৃষ্ণ সে সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের নিকট সংযম-ব্রতী ও ভক্তি-শিক্ষার্থী হইয়া সাধন করেন। কেশবচন্দ্র এই সময়ে গেরুয়াধারী যোগী বলিলেই হয়।

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের বিবাহ উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের প্রধানগণ তীব্র আন্দোলন করেন। অবশেষে ইঁহাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনাথ এই নূতন সমাজের প্রাণ ছিলেন। গোস্বামীর ব্যাকুল উপাসনা ও বক্তৃতায় লোকের প্রাণ আকৃষ্ট হইত। পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজেও বিজয়কৃষ্ণ অনেকদিন আচার্য ছিলেন।

একবার বিজয়কৃষ্ণ প্রচার কার্যে গয়া গমন করেন। সেখানে আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে এক বৈষ্ণব সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে ভক্তিভাব অতি প্রবল। ধ্যানধারণা দ্বারা সাধনায় তাঁহার মন ক্রমশঃ নিবিষ্ট হইতেছিল। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সাধুর কুটীরে তিনি অনেকদিন ধ্যানে ও সাধনায় কাটাইয়া দেন। এই সময়ে তিনি গেরুয়া পরিধান করিতেন।

এইরূপে গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের নূতন অধ্যায় শুরু হইতে চলিল। নূতন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৈরিক ধারণ করিলেও বিজয়কৃষ্ণ তখনও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ও আচার্য। ইহার পর তিনি ঢাকায় আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে বাস করেন। ১২৯০ সনে তিনি যোগসাধন অভ্যাস করেন। ইহার দুই বৎসর পরে বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁহার "আশাবতীর উপাখ্যান" প্রকাশিত হয়। উহাতে তাঁহার সাধনার কথা লিখিত।

যোগ সাধনার কিছু কাল পর হইতে গোস্বামী মহাশয় গুরুর অভিপ্রায় অনুসারে লোকেদের যোগদীক্ষা দিতে থাকেন। মন্ত্র দ্বারা শিষ্য করা ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম-বহির্ভূত। এই লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোস্বামী মহাশয় ঢাকা সহরের গেণ্ডারিয়া নামক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে নিজের সাধনাশ্রম স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি বাস করেন। এই নিবিড় বৃক্ষ-পরিপূর্ণ নীরব ও শান্ত আশ্রমটি আজ লোকালয়ে অবস্থিত হইয়া তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এককালে ইহার গভীর অরণ্যের গোরস্থানে কয়েকজন ফকিরের সাধনস্থল ছিল মাত্র। এইখানে কুটীর নির্মিত হইল। গোস্বামী মহাশয় এখানে অনুরাগী-দের সহিত পাঠ, কীর্তন, ভজন-সাধন ও সদালাপে ধর্মসাধন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ঘড়ি ধরিয়া সব কাজ হইত। গোস্বামী মহাশয় শুধু বৃদ্ধদের ধর্মসাধনের সহায় হন নাই। তাঁহার প্রভাবে স্কুলকলেজের ছেলেদের নৈতিক জীবনও যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল।

ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করিলেও গোস্বামী মহাশয় মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাইয়া থাকিতেন। একবার সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়া-ছিলেন। সেখানে বিসূচিকায় তাঁহার সহধর্মিণীর দেহ ত্যাগ হয়। ১৩০০ সনে তিনি শিষ্যদের লইয়া এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় যান। ভারতবর্ষে সাধু-সন্ন্যাসীদের এত বড় সম্মেলন আর নাই। তাঁহার অসামান্য ভক্তিভাবে তিনি মেলার সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১২৯৮ সনে কলিকাতা থাকিতে গোস্বামী মহাশয় মহর্ষির সঙ্গে দেখা করিতে যান। মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া ভাব-গদগদ হইয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। আপনাকে দেখিলে আমার ব্রহ্মদর্শনের ফল হয়। মহর্ষিও ভাবে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।" এই বলিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। পরে অনেক ধর্মালাপ হইল।

গোস্বামী মহাশয় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বিরোধী ছিলেন। সাধন পথে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধির পথ

রেখাঙ্কিত হইয়া দেখা দেয়। উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা তখন আর সম্ভব হয় না। ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী তাঁহার সাধনার পথে প্রথম জীবনে সহায়ক হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরজীবনে তাঁহাকে উহার বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর জীবন গোস্বামী মহাশয়ের অতি-বড় আপনার বস্তু ছিল। কত সময় মহাপ্রভুর নামে বিভোর হইয়া 'শচীনন্দন শচীনন্দন' বলিয়া আকুল হইতেন। একবার বলিয়াছিলেন—"যখন ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম তখন একদিন হাজারিবাগের রাস্তায় নির্জনে এই অভিপ্রায়ে গড়াগড়ি দিয়াছিলাম যে মহাপ্রভু এই পথে গিয়াছিলেন, যদি তাঁহার পদধূলির এক কণাও গায়ে লাগে, কৃতার্থ হইব।"

মহাপ্রভুর শেষ অর্ধেক জীবন নীলাচলে কাটিয়াছিল। তাই নীলাচল বৈষ্ণবের পুণ্যতীর্থ। ইহার প্রতি ধূলিকণাও সেই প্রেমের ঠাকুরের স্পর্শে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় এই পুণ্যক্ষেত্রে শেষ জীবনের আশ্রয় করিয়াছিলেন।

১৩০৪ সনে কলিকাতা হইতে পুরী গমন করেন। পুরীতে গোস্বামী মহাশয় 'জটিয়া বাবা' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার অসামান্য দানের জন্য খ্যাতি রটিয়াছিল। ভগবৎ নির্দেশে তিনি দানছত্র খুলিয়াছিলেন। নিজের আশ্রমেই প্রত্যহ মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দীনদরিদ্র দুঃখী কাঙ্গালকে পরিতোষ করিয়া খাওয়ানো গোস্বামী মহাশয়ের নিত্য ব্রত ছিল। ইহাতে তিনি অপার আনন্দ পাইতেন। অনেক সময় ঘটী, কম্বল, রেশমি কাপড় ইত্যাদিও দান করিতেন। সহস্র সহস্র মুদ্রা এইজন্য ব্যয়িত হইত।

বিরাট মহোৎসব করিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ তাঁহার অন্যতম কার্য ছিল। জীবনের শেষ মহোৎসবে তাঁহার প্রচুর ঋণ হয়। উহা অবশেষে পরিশোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও পরপারের আহ্বান

আসে। ১৩০৬ সনে ২০শে জ্যৈষ্ঠ এই ভক্তবীর পুণ্য পুরুষ নীলাচলের মহাতীর্থে মহাপ্রয়াণ করেন। পুরীর নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হয়। এখানে গোঁসাইর আশ্রমটি বড়ই মনোরম—গাছপালায় ঘেরা শান্তি ও সাধনের নিভৃত নিলয়।

গোঁসাইর অমৃতবাণী উচ্চারণ করিয়া এই চরিতামৃত শেষ করিতেছি। তিনি বলিতেন—"আমাদের কোন সম্প্রদায় নাই, আর আপনাকে কোন সম্প্রদায়ভুক্তও মনে করি না। যিনি যে ভাবে ধর্মাচরণ করিতেছেন করুন, কাহাকেও নিন্দা করি না, বরং প্রশংসার যদি কিছু থাকে তাহাই বলিব।

"শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকিলে গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন। আর তখন বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না। ধর্মের নামে সম্প্রদায় গঠন করা ও বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা অপরাধ। ভগবান কর্তা, তিনি কাহাকে কি উপায়ে উদ্ধার করিবেন তাহা আমি কি জানি, এই মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত। বিবেক উজ্জ্বল থাকিলে যেমন নিজের মতের তেমনি অন্যের মতেরও সম্মান করা যায়। ভুলভ্রান্তি সকলেরই থাকিতে পারে, কিন্তু উহা সময়ে চলিয়া যাইবে। কেবল নিজের মতের লোকদিগকেই উত্তম মনে করা অনুদারতা।"

স্বামী বিবেকানন্দ

জিজ্ঞাসা

গঙ্গাতীর। ঘাটে একখানি বড় বোট। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন গঙ্গায় বাস করিতেন। বোটের ভিতরে সেই মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে বাহিরের দরজায় জোরে আঘাত পড়িল। মহর্ষির ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সম্মুখে চাহিয়া দেখেন পাগলের-মত-চোখ এক যুবক দাঁড়াইয়া। যুবক মহর্ষিকে দেখিবামাত্র আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন—'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?' পাগলের এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'নরেন্দ্র, তোমার চক্ষু দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি যোগী।' যুবকের মনে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা তো ইহাতে শান্ত হইল না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিলেন।

যুবকের মনে পড়িল, দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল ঠাকুরের কথা। তিনি কি যুবকের প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন? পরদিন ভোরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলেন। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে ধর্মালাপ করিতেছেন। যুবক ঠাকুরের নিকট যাইয়াই সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?' ঠাকুর হাসিমুখে উত্তর দিলেন—'হাঁ, দেখেছি। তোকে যেমন দেখ্‌ছি, এর চেয়েও স্পষ্ট তাঁকে দেখেছি? তুই দেখ্‌বি?' নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মৌন হইলেন।

এই যুবক নরেন্দ্রনাথই বাংলার বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্রনাথের মিলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। ইহারই ফলে নব্য বাংলার সৃষ্টি—নব জাগরণের অভ্যুদয়।

বাল্য-জীবন

কলিকাতার শিমলা পল্লীর বিশ্বনাথ দত্ত বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। বিবেকানন্দের পিতৃ-দত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছোটকালে গৃহশিক্ষকের নিকট নরেন্দ্রনাথের পড়া শুরু হয়। ইহার পর তিনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হইলেন। স্কুলে শীঘ্রই তিনি একদল ছেলের সর্দার হইয়া উঠিলেন। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধূলায় তাঁহার মাতামাতি বেশী ছিল। স্কুলে পড়িবার সময়ই তিনি কুস্তি কসরৎ বক্সিং প্রভৃতি শরীর-চর্চা করিতেন। তাঁহার সুন্দর ও সুপুষ্ট শরীর সত্যই লোভনীয় ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল। উহার অনেক জায়গা তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। রামভক্ত মহাবীর হনুমানের চরিত্র তাঁহার নিকট খুব ভালো লাগিত। শেষ জীবনেও তিনি মহাবীরের আদর্শ ও নিষ্ঠার কথা জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মন অত্যন্ত বিচারপ্রবণ ছিল। হাতে হাতে পরীক্ষা না করিয়া কোন মতামত তিনি সহজে গ্রহণ করিতেন না। এখানে বিবেকানন্দের বাল্যকালের একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার বাবার বৈঠকখানায় তামাক খাওয়ার জন্য অনেক হুকা সাজানো থাকিত। প্রত্যেক জাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুকা ছিল। একদিন বিবেকানন্দ হুকাগুলি একে একে

মুখে লাগাইয়া টানিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার বাবা ঘরে ঢুকিয়া ছেলের কার্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি করছিস্‌রে বিলে ?' পুত্র উত্তর দিলেন—'যদি জাতিভেদ না মানি, তা হলে কি হয় তাই পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।'

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্‌ কলেজে ভর্তি হইলেন। এই কলেজ এখন স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজ নামে বিখ্যাত। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠার বছর।

কলেজে নরেন্দ্রনাথকে সকলেই ভালবাসিত। তাঁহার মিষ্টি গলা, মধুর গান, সবল শরীর, সর্বোপরি তাঁহার টানা-টানা বড় বড় চোখ সকলকেই আকৃষ্ট করিত। মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় নরেন্দ্রনাথের এক শ্রেণী উপরে পড়িতেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। দর্শন শাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল বেশী। নরেন্দ্রনাথ বন্ধুর সহিত পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র পড়েন। এই সময়েই তাঁহার মনে ধর্মভাব জাগে ; ঈশ্বরকে জানিবার ও পাইবার আগ্রহ জাগে। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন। প্রত্যেক রবিবার উপাসনার সময় তাঁহার মধুর কণ্ঠ সমাজ-মন্দিরে শোনা যাইত। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহার প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে পারিল না। মহর্ষির নিকট ব্যাকুল চিত্তে তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। নরেন্দ্রনাথ সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাইয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের নিকটে।

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ

তখন নরেন্দ্রনাথ এফ্-এ ক্লাশের ছাত্র। একদিন শিমলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সেইদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গান করেন। গান শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

ইহার পর নরেন্দ্রনাথ এফ্-এ পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। দাক্ষণেশ্বরে যাওয়ার কথা একরূপ ভুলিয়া গেলেন। পরীক্ষার পর তাঁহার পিতা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিবাহে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি বড়ই দুর্ভাবনায় পড়িলেন। তখন তাঁহার মন সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল। রামচন্দ্র দত্ত নামে রামকৃষ্ণদেবের একজন ভক্ত তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের মনের কথা শুনিয়া একদিন তিনি বলিলেন, "তুমি সত্যের জন্য এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? সত্যই যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে তবে দক্ষিণেশ্বরে চল।"

একদিন নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পাইয়া নিতান্ত আপনার জনের ন্যায়, কত কালের পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ একটি গান গাহিলেন। গান শুনিয়া ভাব-বিভোর ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে একান্তে লইয়া গেলেন। তারপর পুলকাশ্রুলোচনে নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"তুই এতদিন কেমন ক'রে আমায় ভুলে ছিলি। তুই আস্‌বি বলে কতদিন ধরে আমি পথপানে চেয়ে আছি! বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর মত

যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাব।" অবশেষে ঠাকুর এক অদ্ভুত কাণ্ড করিলেন। তিনি হাত জোর করিয়া নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি জানি তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি—নররূপী নারায়ণ—জীবের কল্যাণ কামনায় দেহ ধারণ করিয়াছ।"

নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি অদ্ভুত উন্মত্ততা! লোকটি নিশ্চয়ই বদ্ধপাগল। আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্র নাথ—আমাকে এ সব কি বল্‌ছে?" ইতিমধ্যে ঠাকুর কতকগুলি খাবার লইয়া আসিলেন এবং তাহা একরকম জোর করিয়াই নরেন্দ্রনাথকে খাইতে হইল। তারপর ঠাকুর আবার ভক্তদের মধ্যে আসিয়া সদালাপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ঠাকুরের মধ্যে পাগলামির কিছুমাত্র লক্ষণ নাই; অথচ তাহার কথাগুলির মধ্যে যেন কি গভীর রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। তরুণ নরেন্দ্রনাথের মনে এক বিষম ভাবনার সৃষ্টি করিল।

ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম আলাপ—অথচ কত যে গভীর ও নিবিড় প্রেমে ঠাকুর তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এমন করিয়াও মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে পারে!

প্রায় মাসখানেক পরে নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে যান। ঠাকুর সেদিন একা তাঁর ছোট বিছানাটির উপর বসিয়া আছেন, নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ভারি খুসী হইলেন। তাঁহাকে নিজের পাশেই বসাইলেন। পরক্ষণেই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। তিনি গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ডান পা'খানি নরেন্দ্রনাথের শরীরে স্থাপন করিলেন। অমনি নরেনের ভিতরে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখের সম্মুখ থেকে ঘরের দেয়াল, আসবাব-পত্র সমস্ত

অদৃশ্য হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ লোপ পাইতে লাগিল। একটা অসীম শূন্যতা তাঁহার চারিদিক্ ঘিরিয়া ফেলিল; নিজেকেও তাহাতেই হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম হইল। তিনি ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো তুমি আমায় এ কি করলে? আমার যে বাপ-মা আছেন!" ঠাকুর হাসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার মনে এক গভীর সমস্যার উদয় হইল। এ কি মহাপুরুষদের চির-আকাঙ্ক্ষিত সমাধির অনুভূতি, না পাগল ঠাকুরের বশীকরণ বিদ্যা (hypnotism)? বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ স্বাধীন চিন্তাশীল দৃঢ়মনা পুরুষ ছিলেন। যুক্তিতর্ক ও বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনি যা কিছু মতামত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার মন যেন থৈ পাইতেছিল না।

যে সময়ে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ দেবের নিকট গতায়াত করিতেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় তিনি তিনি নিয়মিত যোগদান করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে নরেন্দ্রনাথের সুললিত সঙ্গীত শোনা যাইত। ঠাকুরের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ভক্তদের খুব অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল। ইঁহারা অনেক সময় দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের সহিত ধর্মালাপ করিয়া কাটাইতেন।

ঠাকুর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে বুঝিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথের মত ছেলেকে ঠিকমত গড়িয়া তুলিতে পারিলে, তাঁহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। নরেন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় ভবিষ্যৎ ঠাকুরের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। অনেক সময় সে কথা ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। একবার কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তগণের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িল। অবশেষে কেশব ও বিজয় চলিয়া

গেলে তিনি ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "দেখলুম কেশব যে শক্তিবলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, নরেন্দ্রের মধ্যে অমন আঠারটা শক্তি রয়েছে। কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বল্‌ছে, ওর মধ্যে জ্ঞানসূর্য রয়েছে।" এই অযাচিত প্রশংসায় নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন, "বলেন কি মশাই! কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় একটা নগণ্য কলেজের ছোঁড়া নরেন্দ্র! লোকে শুন্‌লে আপনাকে পাগল বল্‌বে।" ঠাকুর হাসিয়া সরল ভাবে উত্তর দিলেন,—"তা কি কর্‌ব বল? মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বল্‌ছি।" নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন,—"মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল—কেমন ক'রে বুঝবো! আমার তো মশাই ওরকম হ'লে খেয়াল দেখেছি বলেই বিশ্বাস হ'ত।" নরেন্দ্রনাথের উপর ঠাকুরের এই রকম অসাধারণ আস্থা যেমন ছিল, আবার তেমনি তাঁহাকে সকল হৃদয় দিয়া ভালও বাসিতেন। নরেনের জন্য ঠাকুরের যে কি ভালবাসা কি আকর্ষণ তাহা কথায় প্রকাশ সম্ভব নয়। একবার কয়েক দিনের জন্য নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। নরেন্দ্রনাথের এই কয়দিনের অদর্শনে ঠাকুর বিষম কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি একজন ভক্তের নিকট নরেন্দ্রনাথের গুণকীর্তন করিতে করিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন—"মা মা, আমি যে ওকে না দেখে বাঁচি না।" এমন আকুলতা, এমন ভালবাসার কথা কে কবে শুনিয়াছে? নরেন্দ্রের জন্য ঠাকুর একবার ক্রমান্বয়ে ছ' মাস অসহ্য যাতনা অনুভব করিয়াছেন। এমন দিনও গিয়াছে নরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ঠাকুর স্বয়ং কলিকাতায় গিয়াছেন। একদিন ত নরেন্দ্রনাথের খোঁজে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া রীতিমত অপদস্থ হইয়াই আসিলেন।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই গুরু বলিয়া আত্মসমর্পণ করেন নাই। ঠাকুরের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে

বিচার করিয়াছেন, যাচাই করিয়াছেন, সংশয়াকুল চিত্তে পরীক্ষা করিয়াছেন। অথচ ঠাকুরের জন্যও নরেন্দ্রনাথ অন্তরে অন্তরে একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করিতেন। তাই নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই এখানে আসি, তোমার কথা শুনিতে ত আসি না।

পিতৃ-বিয়োগ

বি-এ পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ একদিন বরাহনগরে এক বন্ধুর গৃহে রাত্রিতে গীতবাদ্যাদি আনন্দে রত ছিলেন, এমন সময়ে কে-একজন যাইয়া খবর দিল, নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় হৃদ্‌রোগে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সকলের হাস্য-কোলাহল মুহূর্তে কোথায় উড়িয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ পাগলের মত বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখন এক বিষম সমস্যা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বিশ্বনাথ দত্ত উপার্জন যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া সঞ্চয় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনের পূর্বেই চাকুরীর চেষ্টায় নরেন্দ্রনাথকে বাহির হইতে হইল। কিন্তু তিন চারি মাস ঘুরাঘুরি করিয়াও কোন সুবিধা হইল না। এই বিপদের সময় আবার জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে গৃহচ্যুত করিবার জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ছোট ছোট ভাইদের ও বিধবা মাকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ বিষম মুস্কিলে পড়িলেন। এমন বিপদে পড়িলে লোকের ভগবানে বিশ্বাস টলিয়া যায়। একদিন নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া শয্যাত্যাগ

করিতেছেন। ইহা শুনিবামাত্র মা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "চুপ কর্ ছোঁড়া। ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান্ ভগবান্। ভগবান্ ত সব কল্লেন!" কথাগুলি নরেনের অন্তরে বড় আঘাত দিল। ভগবানের করুণায় সংশয় তাঁহার মনেও জাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মনের সংশয় বন্ধুদের নিকট অকপটে বলিতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খোলামন ছিলেন। লুকোচুরি তাঁহার সইত না। সকল রকম ভণ্ডামি বা ছলচাতুরী তিনি বিষম ঘৃণা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর অনেকদিন নানা ঝঞ্ঝাটে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে পারেন নাই। ওদিকে ঠাকুরের অনেক ভক্ত শুনিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ নাকি খারাপ হইয়া গিয়াছে। এ দুর্নাম নরেন্দ্রনাথের কানেও গিয়াছিল। তাই অভিমানে তিনি ঠাকুরের সহিত দেখা করেন নাই। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার এই দুর্নাম শুনিয়া কি বলিয়াছিলেন? তিনি ভক্তদের ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন, "চুপ কর্ শালারা। মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না। আর কখনও ঐ সব কথা বলিলে তোদের মুখ দর্শন করিব না।" ঠাকুরের এমনি অগাধ আস্থা ছিল নরেন্দ্রনাথের উপরে।

ইহার মধ্যে ঠাকুর একদিন কলিকাতায় আসিয়াছেন। শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে আবার তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল। সাংসারিক কষ্টে একান্ত উত্যক্ত হইয়া একদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যাইয়া বলিলেন—"যাহাতে আমার মা ও ভাইবোনদের দু'বেলা দু মুঠো ভাত জোটে, সেজন্যে আপনার মাকে অনুরোধ করিতে হইবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, আমি কোন দিন মার কাছে কিছু চাই নাই। তবু তোদের যাতে একটু সুবিধা হয় সেজন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস্ না, তাই মা তোর কথায় কান দেয় না।" নরেন্দ্রনাথ কঠোর নিরাকারবাদী।

সাকারে কিছুমাত্র বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। তাঁহার সম্মুখে এ কি বিষম পরীক্ষা! অবশেষে ঠাকুর বলিলেন—"যা, আজ রাত্রে মাকে প্রণাম ক'রে তুই যা চাইবি তাই পাইবি।"

ঠাকুরের পাথরের মা-টিকে এবার যাচাই করিতে পাইব—এইরূপ সংকল্প লইয়া নরেন্দ্রনাথ গভীর রাত্রিতে কালী-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন—মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ীরূপে বরাভয় কর প্রসারিত করিয়া মৃদু হাস্য করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সব ভুলিয়া গেলেন। ভক্তিবিহ্বল চিত্তে প্রার্থনা করিলেন—"মা, আমায় বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি দাও। যেন তোমার কৃপায় তোমায় সর্বদাই দেখিতে পাই মা।" নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরের কথায় তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। তিনি এ কি করিয়াছেন? এইরূপ বার বার তিন বার মা'র নিকট প্রার্থনা করিতে গেলেন। কিন্তু কোন বারই ভাত কাপড়ের প্রার্থনা তাঁহার মুখে আসিল না। অবশেষে ঠাকুর বলিলেন—"তুই যখন চাইতে পারলি না তখন তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই। তবে তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।" সংসার সুখের জন্য নরেন্দ্রনাথ লালায়িত ছিলেন না। কাজেই ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের জীবনে এখন হইতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

ঠাকুরের তিরোধান

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুর গলরোগে বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হইলেন। তখন ভক্তগণ তাঁহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতার শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরের উদ্যানে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কাশীপুরের বাগান-বাটীতে অসুস্থ ঠাকুরকে ঘিরিয়া তাঁহার সকল ভক্ত সমবেত হইলেন। এই উপলক্ষে ভক্তদের প্রাণে প্রাণে বাঁধন পড়িল। ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-সংঘের গোড়া পত্তন এইরূপে শুরু হইল। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, লাটু প্রভৃতি তরুণ ভক্তগণ ঠাকুরের শুশ্রূষার ভার লইলেন। গৃহী ভক্তগণ তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তরুণ ভক্তগণ অনেকেই বাড়ী ছাড়িয়া ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিতেন। ইহাতে অভিভাবকগণ বিচলিত হইয়া উঠিতেন। নরেন্দ্রনাথ সকলকে বুঝাইয়া বালকগণকে যাইতে মানা করিতেন।

ঠাকুরের শুশ্রূষা উপলক্ষে তরুণ ভক্তগণ সাধনপথে অগ্রসর হইবার মত সুযোগ পাইলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই ধ্যানী ছিলেন। কোন কিছু ভাবিতে ভাবিতে তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া যাইতেন। ইহা যেন তাঁহার সহজাত সংস্কার ছিল। এই ক্ষণে ঠাকুরের সান্নিধ্যে তাঁহার ধ্যান সাধনার চরম উন্নতি হইতে লাগিল। কোন দিন তিনি রাত্রিকালে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে যাইয়া ধ্যান করিতে বসিতেন। তীব্র বৈরাগ্যে অস্থির হইয়া একদিন নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় চলিয়া গেলেন। যেখানে বুদ্ধদেব সমাধিস্থ হইয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেই বোধিদ্রুমতলে বসিয়া ধ্যান পিপাসা মিটাইলেন। এইরূপে

কাশীপুর বাগানবাড়ী বালভক্তদের শিক্ষা ও সাধনার পীঠস্থান হইয়া দাঁড়াইল। ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সংঘের সৃষ্টি এই খানেই হইয়াছিল। কি তীব্র বিবেক-বৈরাগ্য তখন সাধকদের হৃদয়ে হৃদয়ে দীপ্ত বহ্নির মত জ্বলিয়াছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। নরেন্দ্রনাথকে একদিন ঠাকুর বলিলেন—"দেখ্, সাধনকালে আমার অষ্টৈশ্বর্য লাভ হয়েছিল। তা কোন দিন কাজে লাগে নি। তুই নে, কালে তোর অনেক কাজে লাগবে।"

নরেন্দ্র। মশায়, ওতে ভগবান্ লাভ কর্বার কোন সুবিধা হবে কি ?

ঠাকুর। না, তা হবে না বটে। কিন্তু ঐহিকের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাক্‌তে না।

নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—তবে মশায় ওতে আমার প্রয়োজন নেই।

এইরূপে একদিকে তীব্র বৈরাগ্য সাধন ও ধ্যান-ধারণা, অন্যদিকে ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে উপনিষদ্, অষ্টাবক্র সংহিতা, পঞ্চদশী, বিবেক-চূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যে নরেন্দ্রনাথ একদিন মানুষকে ভগবান্ (সোঽহং) বলা পাপ মনে করিতেন, সেই নরেন্দ্রনাথ আজ অদ্বৈতজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে চলিয়াছেন। সে দিন গভীর রাত্রি। কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর রোগশয্যায় শায়িত। ঘরে একমাত্র নরেন্দ্রনাথ। আজ তাঁহার সংকল্প—যেমন করিয়াই হোক্ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিতেই হইবে। ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নরেন, তুই কি চাস্?"

নরেন্দ্র। শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চাই।

ঠাকুর। বার বার ঐ কথা বল্‌তে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বট গাছের মত বর্ধিত হয়ে শত শত লোককে

শান্তিছায়া দিবি, তা না করে তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্। এত ক্ষুদ্র তোর আদর্শ!

নরেন্দ্র। নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না। আর যদি তা না হয়, তবে আমি ওসব কিছুই করিতে পারিব না।

ঠাকুর। তুই কি ইচ্ছায় কর্‌বি। জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। তুই না করিস্, তোর হাড় কর্‌বে।

অবশেষে ঠাকুর একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হবে।”

ইহার কিছুদিন পরে একদিন ধ্যানে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ গভীর সমাধিতে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিল। হৃদয় শান্ত ও ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুরকে প্রণাম করিলে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—“এখনকার মতে চাবি দেওয়া রইল। চাবি আমার হাতে, কাজ শেষ হলে তবে খুলে দেওয়া হবে।”

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ ভাগে ঠাকুরের রোগ ভীষণতর হইল। তখন অতি কষ্টে কথা বলিতে পারেন।

সেই অবস্থায় একদিন নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—“নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রইল। তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্ শক্তিমান্, ওদের রক্ষা করিস্, সৎপথে চালাস্। আমি শীগ্‌গীরই দেহত্যাগ কর্‌বো।”

আর একদিন রাত্রে ঠাকুর সজল নয়নে চাহিয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন—“বাবা, আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।” নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ঠাকুরের জীবনের দীপ নির্বাণপ্রায়। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

কিন্তু তখনও নরেন্দ্রনাথের মনের সংশয় যায় নাই। ঠাকুর যে সত্যই ভগবান্ তাহা তো এখনও অমীমাংসিত রহিল। নরেন্দ্রের

মনে যখন এই দ্বন্দ্ব তোলপাড় করিতেছিল, সেই সময়ে ঠাকুর স্পষ্ট অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—"কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই? যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই একাধারে এবার রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।" ঠাকুরের কথায় নরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, লজ্জা ও দুঃখে অধোবদন হইলেন।

অবশেষে মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের দিন সমাগত হইল। ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট সোমবার অতি প্রত্যূষে ভগবান্ রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। বরাহনগরের শ্মশানক্ষেত্রে ঠাকুরের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। শ্মশানভস্ম গায়ে মাখিয়া তরুণ ভক্তদল সর্বত্যাগী সাধক-গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়া নবযুগের পত্তন করিলেন। ইঁহাদেরই নেতা হইয়া নরেন্দ্রনাথ জাতির প্রাণশক্তি উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন।

পরিব্রাজক

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বালসন্ন্যাসিগণ বরাহনগরের একটি ছোট বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই স্থানটি শীঘ্রই একটি তপোভূমি হইয়া উঠিল। দিবারাত্রি পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, পাঠ-কীর্তন, ইত্যাদিতে ভক্তগণ মগ্ন হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ এই বালভক্তদের নেতৃস্থানীয় হইয়া সকল প্রকারে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ের একটি বর্ণনা স্বামী প্রেমানন্দ একদিন দিয়াছিলেন —"আজ যে এই এত-বড় মঠ দেখছো, কোথায় এর আরম্ভ! ঠাকুর যখন অপ্রকট হলেন, লাটু আর কয়টি ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তাঁর স্থান নেই, শেষে সুরেশ মিত্তির বরাহনগরে একটা বাড়ী ঠিক করে

দিলেন। নীচের একতালাটা অব্যবহার্য, উপরের তালায় তিনটে ঘর। ঠাকুরকে কোন দিন দুটো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হত। কি আর জুটবে? এক বেলা ভাত কোনদিন জুট্‌তো, কোনদিন জুট্‌তো না। থালাবাসন তো কিছু নেই, বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে লাউগাছ কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউ পাতা কি একখানা কলাপাতা কাট্‌তে গেলে উড়ে মালী যা' তা' গালি দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হত। তেলাকচুর পাতা সিদ্ধ আর ভাত—তা' আবার মানপাতায় ঢালা! কিছু খেলেই গলা কুট্‌কুট্ কর্‌তো। এত যে কষ্ট, ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দুটি একটি করে বাড়তে লাগ্‌লো। উৎসাহ কত? পূজা ধ্যান জপ সর্বক্ষণ চলেছে। হয়তো কীর্তন লেগে গেল। ঘরের দোর বন্ধ করে ভিতরে জমাট কীর্তন। এমন জমে গেছে যে বাইরে লোক দাঁড়িয়ে গেছে!"

কিছু কাল পরে মঠের ভক্তদের মধ্যে তীর্থ ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। অনেকেই মঠ ছাড়িয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথও সকলের অনুরোধ এড়াইয়া গেরুয়া বসন পরিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। বারাণসী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি-তীর্থক্ষেত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এই সময়ে একবার গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পাওহারী বাবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য স্বামীজি বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া নিরস্ত করিল। এই সময় মাসাধিক কাল তাঁহাকে বিষম দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ না পাওহারী বাবা ইহাই ছিল তাঁহার মনের দারুণ সমস্যা।

ইহার পর হিমালয়ের পাদদেশের তীর্থগুলি দর্শন করিয়া স্বামীজি ১৮৯১ সালে আলোয়ারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শীঘ্রই আলোয়ারের মহারাজ তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে একদিন মহারাজ স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখুন বাবাজী মহারাজ, মূর্তি পূজায় আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, ইহার জন্য আমার কি দুর্গতি হইবে?" মহারাজকে একটু হাসিতে দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন—"মহারাজ কি আমার সহিত রহস্য করিতেছেন?"

মহারাজ। না না স্বামীজি। প্রকৃতই আমি কাঠ মাটি পাথর বা ধাতুর মূর্তিগুলিকে সাধারণের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে পারি না। ইহার জন্য কি পরকালে আমাকে কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে?

স্বামীজি। নিজের বিশ্বাসানুযায়ী উপাসনা করিলে পরকালের শাস্তি পাইতে হইবে কেন? মূর্তিপূজায় আপনার বিশ্বাস নাই, মন্দ কি?

হঠাৎ একখানা ফটোর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এখানি বোধ হয় মহারাজের প্রতিকৃতি?"

দেওয়ান বাহাদুর নিকটেই ছিলেন। স্বামীজি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"উত্তম। আপনি ইহার উপর থুথু ফেলুন দেখি!"

মহারাজের ফটোর উপর থুথু নিক্ষেপ করিবেন এমন স্পর্দ্ধা কাহারো ছিল না। কাজেই এমন কাজ কেহ করিতে রাজী হইলেন না।

তখন স্বামীজি মহারাজকে বলিলেন—"দেখুন মহারাজ, এই ছবিখানি একদিক্ দিয়া দেখিলে আপনি নন, অন্যদিক্ দিয়া ইহাতেও আপনার অস্তিত্ব আছে। কাজেই মহারাজের অনুরক্ত ও সেবকগণ ইহাকে অসম্মান করিতে পারেন না। ভগবানের বিগ্রহগুলিও সেইরূপ তাঁহারই অনন্ত সত্তার বিশেষ গুণবাচক মূর্তি মাত্র। ভক্তগণ সেই মূর্তির ভিতর ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া তাহাকে পূজা করেন। এমন কোন হিন্দু আমি দেখি নাই যে বলিয়া থাকে যে—হে প্রস্তর, আমি তোমাকে পূজা করি।"

স্বামীজির এই যুক্তিপূর্ণ উত্তর মহারাজের জীবনে এক পরিবর্তন আনিয়া দিল। এখান হইতে স্বামীজি জয়পুরে যান এবং সেখানে জয়পুররাজের একজন বিখ্যাত সভাপণ্ডিতের নিকট অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি অধ্যয়ন করেন।

এই সময় ক্ষেত্রীর রাজা স্বামীজির গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। স্বামীজির সহিত প্রথম সাক্ষাতে রাজা-বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"স্বামীজি, জীবনটা কি?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল—"একটা অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমাগত স্ব-স্বরূপে ব্যক্ত হইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃ-প্রকৃতি তাহাকে দাবাইয়া রাখিতেছে—এই চেষ্টার নামই জীবন।" এইখানে রাজা বাহাদুরের সভাপণ্ডিতের নিকট স্বামীজি পাণিনির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর স্বামীজি গুজরাট পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই হইয়া দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যে গমন করেন। মহীশূর হইতে কোচিন ঘুরিয়া স্বামীজি ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে কন্যাকুমারিকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একদিকে দিগন্তপ্রসারী নীল জলরাশি, অন্যদিকে ভারতের নদীগিরি ও বনানী, এমন স্থানে প্রস্তরাসনে স্বামীজি ধ্যানমগ্ন। সমগ্র ভারতের প্রতিচ্ছবি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, বুভুক্ষু ভারতের করুণ চিত্র তাঁহার মর্মে মর্মে আঘাত দিয়া ক্লিষ্ট করিয়া তুলিল। ভবিষ্যৎ কর্তব্যের পন্থা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন সহস্র অত্যাচারে উৎপীড়িত কঙ্কাল মাত্রে পর্যবসিত ভারতের মহাশ্মশানে প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। ঠাকুর বলিতেন—'খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।' বুভুক্ষুকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার মত অপমান আর কি হইতে পারে? স্বামীজি দৃঢ় পণ করিলেন, "শ্রীগুরুর আশীর্বাদে এ ভার আমি গ্রহণ করিব। কোটি কোটি

দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন পাত করিব। অর্থশালী পাশ্চাত্য জগতে যাইয়া অর্থ উপার্জন করিব—সেই অর্থসাহায্যে দরিদ্র ভারতের দুর্দশা দূর করিব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব।"

এইরূপে পরিব্রাজক স্বামীজির সমগ্র ভারত ভ্রমণ সার্থক হইল।

ইহার পর স্বামীজি মাদ্রাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার যুবকগণ তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। এই সময়ে আমেরিকার চিকাগো সহরে পৃথিবীর সকল প্রতিনিধিদের লইয়া এক ধর্ম-মহাসম্মেলনীর আয়োজন হইতেছিল। স্বামীজির উৎসাহী মাদ্রাজী শিষ্যগণ তাঁহাকে হিন্দুধর্মের মুখপাত্র-রূপে আমেরিকায় পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। স্বামীজি শ্রীশ্রীমাতার (ঠাকুরের সহধর্মিণী) আদেশের জন্য লিখিলেন। যথাসময়ে অনুমতি আসিল। এদিকে ক্ষেত্রীর মহারাজ স্বয়ং বিদেশ-যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। অবশেষে ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে বোম্বাই বন্দর হইতে গৈরিকমণ্ডিত ভারতের এই নবীন সন্ন্যাসী মার্কিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পাশ্চাত্য অভিযান

বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া চীন জাপান হইয়া স্বামীজি আমেরিকায় পৌঁছিলেন। পথে জাপানী প্রভৃতি উন্নতিশীল জাতির কর্মোদ্যম তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। একখানি চিঠিতে তিনি সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"...তোমরা কি কোচ্চো? সারা জীবন কেবল বাজে বোক্‌চো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকাও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাতি যায়। এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে

নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করে শক্তি ক্ষয় করেচো।

"এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এস, বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেওনা—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেওনা—সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এইরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।"

চিকাগোতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজি দেখিলেন, ধর্মমহাসভা খুলিতে তখনও তিন মাস বিলম্ব আছে। আর, সেখানে প্রবেশ করিবার সুযোগও তাঁহার নাই। কারণ, তিনি হিন্দুধর্মের অনাহূত প্রতিনিধি। এদিকে তাঁহার টাকা-পয়সাও ফুরাইয়া আসিল। অবশেষে তিনি বোষ্টন সহরে গেলেন। সেখানে এক দয়াবতী মহিলার আতিথ্য লাভ করিলেন। এই নৈরাশ্য এবং বাধাবিপত্তির সময়েও স্বামীজি অন্তরের উৎসাহে লিখিয়াছিলেন—"এখানে আসিবার পূর্বে যে সব সোনার স্বপন দেখিতাম তাহা ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে, শত শতবার মনে হইতেছিল, এদেশ হইতে চলিয়া যাই। কিন্তু আবার মনে হয় আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সব দর্শন করিতেছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

এই সময়েই আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"কোমর বাঁধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কার্যের জন্য ডাকিয়াছেন। আমি সমস্ত জীবন নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছি; প্রাণপ্রিয় নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর ও বদমাস বলিয়াছে।

আমি এসমস্তই সহ্য করিয়াছি তাদের জন্য যারা আমায় উপহাস অবজ্ঞা করিয়াছে। বৎস, এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কি মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের হৃদয়বেদন অনুভব কর; অকপট হইয়া ইহাদিগের জন্য ভগবানের নিক সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি বর্ষে পর বর্ষ ধরিয়া এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে ও এই দুঃখভার হৃদয়ে ধার করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। তথাকথিত ধনী ও বড় লোকদের দ্বা দ্বারে গিয়াছি। অবশেষে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই সুদূর বিদেশে সাহায্য লাভে প্রত্যাশায় উপস্থিত হইয়াছি। ভগবান্ দয়াময়! তিনি অবশ্ সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে শীতে ও অনাহারে মরি পারি, কিন্তু হে যুবকগণ! আমি তোমাদের নিকট দরিদ্র পতি উৎপীড়িতগণের জন্য এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি তোমরা এই ত্রিশ কোটি নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর যাহা দিন দিন গভীরতম অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছে। প্রভুর নাম জয়য হউক—আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। এই চেষ্টায় শত প্রাণত্যাগ করিতে পারে, আবার সহস্রজন এই কর্মের জন্য প্রস্ত হইবে। বিশ্বাস—সহানুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস—জ্বলন্ত সহানুভূ —অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"

পূর্বোক্ত মহিলার সাহায্যে একখানি পরিচয়-পত্র যো করিয়া স্বামীজি পুনরায় চিকাগোতে যাইয়া উপস্থিত হইলে কিন্তু সেখানে যাইয়া ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন শীতের রাত্রে কোথাও কোন আশ্রয়ও পাইলেন না। হোটেল কালা আদমীকে স্থান দিল না। অগত্যা স্বামীজি রেল মালগুদামের একটি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে সে রাত্রির জন্য আ লইলেন। বাহিরে বরফ পড়িতেছে, বাক্সের ভিতরে গভীর অন্ধক গরম কাপড়ের অভাবে স্বামীজির সকল শরীর শীতে অবশ ক

ফেলিল। এই দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিয়া পরদিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিলেন। পাইলেন উপেক্ষা অবজ্ঞা আর ভর্ৎসনা। এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত স্বামীজির পরিচয় হইল। ইনিই অবশেষে ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজির সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহারই গৃহে স্বামীজি সম্মানিত অতিথিরূপে ঠাঁই পাইয়াছিলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এক স্মরণীয় দিন। স্বামীজির জীবনে এবং ভারতের নবজাগরণের সে এক পুণ্যতিথি। ধর্ম-মহাসভার অধিবেশনে সেই দিন শুরু হইল। স্বামী বিবেকানন্দ সেইদিন পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। তাঁহারই নিজের কথায় সেদিনের বর্ণনা একটু দিই।

"কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, তাহার পর এক প্রকাণ্ড গ্যালারি, তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেসাঘেসি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্ল্যাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতিপূর্বক ধূমধামের সহিত আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুড়্ দুড়্ করিতেছিল এবং জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ। আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

“আমি [illegible]দিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু’এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি ‘আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃগণ’ বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল আমি তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর স্বামী সত্যই বলিয়াছেন, মূকং করোতি বাচালং। হে ভগবন্, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম। আর, যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেদিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে আর কোনদিন সেরূপ হয় নাই।”

এইরূপে স্বামীজির নাম পাশ্চাত্য জগতে বিদ্যুদ্‌বেগে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে স্বামীজির প্রচার কার্যে বিশেষ সুবিধা হইল। ধর্ম মহাসভার অধিবেশনের পরে তিনি আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছোট বড় সকল সহরে বক্তৃতা দিয়া হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এই ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় ভ্রমণে ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় আমেরিকায় তাঁহার নাম হইয়াছিল ‘The Cyclonic Hindu’। স্বামীজির প্রচারের ফলে শীঘ্রই একদল লোক তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনি কয়েকজন ত্যাগী শিষ্য ও শিষ্যা লাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজির এই বিজয়-অভিযানের পথে অনেক নিন্দা ও অখ্যাতি সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার অনেক স্বদেশবাসীও এই নিন্দুকের দলে মিশিয়া স্বামীজিকে অপদস্থ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু

স্বামীজি ঠাকুরের সেই উক্তি "লোক না পোক" ইহাই স্মরণ করিয়া এই হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া বীরদর্পে চলিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত ধর্ম প্রচারের স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুধু বক্তৃতায় তাহার হিন্দুধর্মের প্রচার কার্য নিবদ্ধ ছিল না। তিনি উদ্যোগী ও অনুরাগী শিষ্যদের লইয়া জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস খুলিয়া দিলেন। সেই লরেন্স নদীস্থ সহস্র 'দ্বীপোদ্যান' নামক দ্বীপে তাঁহার এক শিষ্যার একখানি বাড়ী ছিল। স্বামীজি এই সুন্দর বাড়ীটিতে অনেকদিন শিষ্যদের লইয়া ধর্মচর্চা করিতেন। এইখানে থাকিতেই তাঁহার 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটী লিখিত হয়। এই দুই তিন বৎসর উপর্যুপরি প্রবল প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার অন্তরাত্মা একটু বিশ্রামের জন্য যেন কাঁদিয়া উঠিত। "I long—Oh ! long for my rags, my shaven head, my sleep under the trees and my food from begging."

এই সহস্র দ্বীপোদ্যানের অনেক উপদেশ পরে Inspired Talks (দেববাণী) নামে মুদ্রিত হইয়াছে। স্বামীজি শিষ্যদের সহিত অতি কোমল ও নম্র ব্যবহার করিতেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, বীর সন্ন্যাসীর কমনীয় স্বভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। শিষ্যগণ যেমন স্বামীজিকে ভালবাসিতেন, স্বামীজিও শিষ্যদিগকে ততোধিক প্রীতির আকর্ষণে টানিতেন। অনেক সময়ে তিনি উপাদেয় ভারতীয় খাদ্য নিজেই তৈরী করিয়া শিষ্যদিগকে খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তি পাইতেন। স্বামীজি খুব ভাল রান্না করিতে জানিতেন।

দুই বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্বামীজি আমেরিকা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। আমেরিকায় তাঁহার নবদীক্ষিত শিষ্য স্বামী অভয়ানন্দ (ম্যাডাম মেরী লুইস্), স্বামী কৃপানন্দ (ডাক্তার ম্যাণ্ডস্‌বার্গ), সিষ্টার হরিদাসী প্রচারের ভার গ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডে কিছুকাল বেদান্তধর্ম প্রচারের পর স্বামীজি পুনরায় আমেরিকায় গমন করিলেন। সেখানে এবার কর্মযোগ ও ভক্তি-যোগ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময়ে গুড্‌উইন নামক একজন সাঙ্কেতিক লিপিজ্ঞ স্বামীজির পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় আমরা স্বামীজির বক্তৃতা-সকল পড়িবার অধিকারী হইয়াছি। এইবার নিউইয়র্কে স্থায়ী ভাবে একটি 'বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপর ১৮৯৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে স্বামী সারদানন্দকে ইংলণ্ডে আনয়ন করিলেন। ইংলণ্ডেও স্বামীজি বক্তৃতা ও নিয়মিত ক্লাশ করিতেন। এখানে তাঁহার কয়েকজন ত্যাগী ও বিশ্বস্ত শিষ্য লাভ হয়। এই সালের মে মাসে স্বামীজির সহিত বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই উভয়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধার সহিত আলাপ পরিচয় করেন। কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় স্বামীজির নিকট রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী লিখিবার প্রস্তাব জানান। স্বামীজির নিকট ঠাকুরের জীবনীর মালমশলা পাইয়া মোক্ষমূলর সাহেব "রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

ইহার পর স্বামীজি ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীতে বেড়াইতে যান। জার্মানীর কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পল ডয়সনের আহ্বান-লিপি পাইয়া সেখানে গমন করেন। স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করিয়া ডয়সন পরম প্রীত হন। ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজি সারদানন্দ স্বামীজিকে আমেরিকায় পাঠাইলেন এবং ইংলণ্ডের কার্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে স্বামী অভেদানন্দকে আনয়ন করিলেন। এইরূপে বিদেশে বেদান্ত প্রচারের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া স্বামীজি স্বদেশে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। সুদীর্ঘ চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। লণ্ডন ছাড়িয়া আসিবার প্রাক্কালে একজন ইংলণ্ডীয় বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্বামীজি, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি গৌরব মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য-ভূমিতে ভ্রমণের পর আপন মাতৃভূমি কেমন লাগিবে?"

স্বামীজি উত্তর দিলেন—"পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম। এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস পবিত্রতম, ভারত এখন আমার পরম তীর্থ।"

স্বদেশ-সেবা

স্বামীজি স্বদেশে ফিরিতেছেন, এ সংবাদে ভারতের সর্বত্র এক প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি হইল। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্বামীজি কলম্বো পৌঁছিলেন। কলম্বো হইতে কলিকাতা পর্যন্ত সে কি উৎসবের আয়োজন। হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া পাশ্চাত্য জগতে যিনি ভারতকে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই বিজয়ী হিন্দু বীরের যথাযোগ্য সম্বর্ধনার জন্য সমগ্র দেশ যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় সহরেই স্বামীজিকে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। রাজা মহারাজা হইতে দেশের দরিদ্রতম অধিবাসী পর্যন্ত স্বামীজির অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছিল। যে স্থানে স্বামীজি ভারতের মাটীতে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন, সেই স্থানে রামনাদের অধিপতি একটি স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানেই বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামীজি একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। স্বামীজি কলিকাতা পৌঁছিলে, তাঁহাকে এক বিরাট সভায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। সেই সভায় স্বামীজি আমাদের

যুবকদের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি—জীবনবলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।”

রামকৃষ্ণ মিশন

কলিকাতায়ও বক্তৃতা কম দিতে হয় নাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি মঠের সন্ন্যাসী ও নবদীক্ষিত ভক্তদের উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি অধ্যাপনা করিতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া স্থায়িভাবে কার্য করিবার সংকল্প এই সময়ে কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। শুধু বক্তৃতা দ্বারা দেশোদ্ধার হবে না, একথা স্বামীজি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন। তাই ১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বামীজি কর্তৃক আহুত হইয়া ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তগণ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই সভার উদ্বোধনে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—“নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণ তন্ত্রে সংঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট্)

নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে যখন ইতর সাধারণ সমধিক সহৃদয় হবে—যখন মত ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখ্‌বে, তখন সাধারণ তন্ত্রের মত কার্য চল্‌তে পারবে। সেই জন্য এই সংঘের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চল্‌তে হবে। তারপর কালে সকলের মত নিয়ে কার্য করা হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ কোরে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কার্যে সহায় হোন।"

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও স্বামীজির কর্মমূলক উপদেশ অনেকের নিকট একটু বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। একদিন এক গুরুভ্রাতা স্পষ্টই প্রতিবাদ করিলেন—ধ্যানধারণা দ্বারা ঈশ্বর লাভই ঠাকুরের উদ্দেশ্য ছিল, স্বামীজির উপদিষ্ট দরিদ্রের সেবা, শিক্ষা বিস্তার, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ঈশ্বর লাভে বিঘ্নকর। এই কথা শুনিবামাত্র স্বামীজি দৃপ্ত সিংহের মত গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি কি বল্‌তে চাও যে লেখাপড়া, সাধারণে ধর্মপ্রচার, আর্ত রোগী অনাথ এদের সেবা করা—দুঃখ দূর করবার চেষ্টা কর্‌লেই অম্‌নি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে? ...তুমি কি মনে কর যে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়ে ভাল বুঝেছো? ...যদি আমি আমার তমোহ্রদে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্মযোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুষের মত নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তা হলে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাব। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই; যারা নিজেদের ভক্তি মুক্তির কামনা ত্যাগ ক'রে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে আমি তাদের চেলা ভৃত্য—ক্রীতদাস।"

মানব-মিত্র

একদিন স্বামীজি ঋগ্বেদ অধ্যাপনা করিতেছিলেন। এমন সময় ঠাকুরের অন্যতম ভক্তশ্রেষ্ঠ নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। কুশল জিজ্ঞাসার পর স্বামীজি হাসিমুখে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জি সি, তুমি বোধ হয় এসব জিনিষ পড়ার কোন দরকার বোধ কর না, চিরকাল কৃষ্ণ বিষ্ণু নিয়েই কাটিয়ে দিলে?" স্বামীজি 'জি সি', বলিয়াই গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিতেন। বিশ্বাসের জ্বলন্ত বিগ্রহ গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন—"বেদ পড়ে আমার কি হবে ভাই? বেদ বুঝবার মত আমার বুদ্ধিও নাই, অবসরও নাই; ও সমস্ত জিনিষকে দূর থেকে প্রণাম করে আমি ভগবান্ রামকৃষ্ণের কৃপায় ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাব।" কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা নরেন, বেদ-বেদান্ত তো অনেক পড়েছো! ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ লাম্পট্যাদি বীভৎস পাপ, আরও কতরকম অন্যায়, অবিচার ও দুঃখ—যাহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—তার কোন প্রতিবিধান তোমার বেদ-বেদান্তে লেখে কি? অমুক সংসারের গৃহিণী যিনি প্রত্যহ পঞ্চাশজন লোককে অন্নবিতরণ করিতেন—আজ তিন দিন হয় তিনি অন্নাভাবে পুত্র কন্যাসহ অনাহারে আছেন। অমুক অমুক সংসারের মহিলাগণ বদমাইসের হস্তে লাঞ্ছিত হয়েছেন—কেউ কেউ উৎপীড়িত হয়ে অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অমুক বাড়ীর বালবিধবা কলঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ভ্রূণহত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করে বসেছে! নরেন, বেদ-বেদান্তের মধ্যে এর কি কোন প্রতিকার পেয়েছো?" গিরিশচন্দ্রের কথা শুনিয়া স্বামীজির চোখ সজল হইয়া উঠিল, তিনি তখনই সে স্থান হইতে

উঠিয়া গেলেন। স্বামীজি চলিয়া গেলে গিরিশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"দেখ্‌লে তোমাদের গুরুর হৃদয় কি মহান্‌ অনুকম্পাপূর্ণ! আমি তাঁকে পণ্ডিত বা প্রতিভাশালী বলে সম্মান করি না, যা মানুষের দুঃখকষ্টের কথা শুন্‌লে করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে—সেই অসীম উদার হৃদয়ের জন্যই শ্রদ্ধা করি।" কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি আসিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখ জি সি, জগতের দুঃখকষ্ট দূর কর্‌বার জন্য—এমন কি একজনেরও বেদনা লাঘব কর্‌বার জন্য আমি সহস্র বার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি! নিজের মুক্তি আমি চাই না। আমি প্রত্যেককে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য কর্‌তে চাই।"

দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রমে স্বামীজির শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে হিমালয়ের পাদদেশে আলমোরাতে যাইতে হইল। সঙ্গে জনকয়েক শিষ্য ও গুরুভ্রাতা চলিলেন।

স্বামীজি আড়াই মাস আলমোরায় ছিলেন। এই সময়েও কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য, মুর্শিদাবাদ দুর্ভিক্ষ নিবারণে স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রয়াস, মাদ্রাজে রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর প্রচার-কার্য—প্রভৃতির তত্ত্বাবধান তিনি করিতেন। অতঃপর স্বামীজি কাশ্মীর পঞ্জাব ও রাজপুতনা পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীজিকে প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। এই সময়ের একটি ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

লাহোরে মতিলাল ঘোষ তখন সার্কাস দেখাইতেছিলেন। মতিবাবু স্বামীজির বাল্যসঙ্গী ও সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই এই প্রতিভাশালী গৌরবোজ্জ্বল সন্ন্যাসীর সহিত খোলামনে আলাপ কারতে পারিতেছিলেন না। স্বামীজি যতই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতেছিলেন, তিনিও ততই সঙ্কুচিত হইতেছিলেন।

শেষে মতিবাবু দীনভাবে বলিলেন—"ভাই তোমায় এখন কি বলে ডাক্‌বো?" স্বামীজি পরম প্রীতিভরে বন্ধুকে বলিলেন—"হাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি।" এই কথায় মতিবাবুর সঙ্কোচ একেবারে দূর হইয়া গেল।

নবযুগের পত্তন

উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে স্বামীজি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে ভাগীরথীতীরে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহার প্রাথমিক ব্যয়ভার স্বামীজির বিদেশী ভক্তরাই বহন করেন।

স্বামীজি এখন থেকে তরুণ সন্ন্যাসী ও য়ুরোপীয় শিষ্যদিগের শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হইলেন। গীতা, বেদান্ত ইত্যাদি নিজে পড়াইতে শুরু করিলেন। কিন্তু শরীরের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতেছিল। বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা হইতেছিল, এমন সময় কলিকাতায় প্লেগ রোগ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল। স্বামীজির বিশ্রাম-সুখ কোথায় চলিয়া গেল। তিনি ভগিনী নিবেদিতা ও শিষ্যগণ সহ কলিকাতায় রোগীর সেবায় ব্রতী হইলেন। অতঃপর স্বামীজি বায়ু পরিবর্তনের জন্য পুনরায় আলমোরা গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য গুড্‌উইনের মৃত্যু-শোক তাঁহাকে খুব আঘাত দিয়াছিল। ও দিকে গাজীপুরের পাওহারী বাবাও এই সময়ে দেহরক্ষা করেন।

কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাজে "প্রবুদ্ধ ভারত" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা এখন আলমোরা হইতেই প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। আলমোরায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া স্বামীজি

ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতিকে লইয়া কাশ্মীর ভ্রমণে বাহির হইলেন। কাশ্মীরের অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী বিখ্যাত তীর্থস্থান। অমরনাথের গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া স্বামীজি ভক্তিভরে শিবপূজা করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। গুহা হইতে বাহির হইয়া ভগিনী নিবেদিতাকে বলিলেন—"দেবাদিদেব মহাদেব আজ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিয়াছেন।"

কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ করিয়া ১৮ই অক্টোবর স্বামীজি বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ভগিনী নিবেদিতা শীঘ্রই বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে ভগিনী নিবেদিতার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার জন্য বাঙালী তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী রহিবে। ইহা ছাড়া এদেশের রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও শিল্প জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা অপূর্ব প্রেরণা দিয়াছেন। মহিমময়ী ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজির ভাবধারার যথার্থ বাহক।

এই সময়েই বেলুড় মঠে ঠাকুরের দেহাবশেষ রক্ষিত পবিত্র তাম্রাধার ও তাঁহার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা হইল। বেলুড় মঠের কথায় একদিন স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন, ভজন, জ্ঞান চর্চার এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তাতে জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে, মানুষের জীবন-গতি ফিরিয়ে দিবে ; জ্ঞান শক্তি যোগ কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals বেরোবে ; এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তে প্রাণের সঞ্চার হবে ; যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ কালে এখানে এসে জুট্‌বে—মনে ঐরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।"

অনেক দিন হইতেই একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প স্বামীজির ছিল। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ হইতে "উদ্বোধন" পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মমত সাধারণে প্রচার করিতে লাগিল।

সাধু নাগ মহাশয়

একদিন বেলুড় মঠে স্বামীজি শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুরের পরম ভক্ত পূর্ববঙ্গের মহাত্যাগী সাধু নাগ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন তো?"

নাগ মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে আইলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল।

আচার্যদেব, স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রসাদ আনিয়া নাগ মহাশয়কে দিতে বলিলেন। নাগ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজির প্রতি করযোড়ে) আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

স্বামীজি। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ্ছিস্, নাগ মহাশয়কে দেখ্। ইনি গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নাই সে জ্ঞান নাই, সর্বদা তন্ময় হয়ে আছেন। (নাগ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের কথা কিছু শোনান।

নাগ মহাশয়। ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বল্‌বো? আমি আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি, ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দেখ্‌তে এসেছি! ঠাকুরের কথা লোকে এখন বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজি। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরে মর্‌লুম।

নাগ মহাশয়। ছিঃ ও কথা কি বল্‌ছেন। আপনি ঠাকুরের ছায়া—এ পিঠ আর ও পিঠ, যার চোখ আছে সে দেখুক।

স্বামীজি। এ সব যে মঠ ফট হচ্ছে একি ঠিক হচ্ছে?

নাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে!

স্বামীজি। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগ মঃ। এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?

স্বামীজি। আমার তো ইচ্ছে আছে। মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ মঃ। আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন। আর সকলে তার কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারে নি।

স্বামীজি। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনমতে জাগাতে পারলে বুঝবো ঠাকুর ও আমাদের আশা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি ফুক্তি সব তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন কৃতকার্য হওয়া যায়।

নাগ মঃ। ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাহাকেও দেখি না, যা ইচ্ছে করবেন—তাই হবে।"

এই সেই নাগ মহাশয়, যাঁর কথায় স্বামীজি বলিয়াছিলেন—'সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের মত সাধু আর একজন দেখিলাম না।'

বিদেশে দ্বিতীয় অভিযান

১৮৯৯ সালের ২০ শে জুন স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ভ্রমণ পথের বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে এবং ভগিনী নিবেদিতার সহিত নানা আলাপ-আলোচনায় এবারকার যাত্রা বড়ই চিত্তাকর্ষক

হইয়াছিল। একদিন জাহাজে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"দেখ, যতই দিন যাইতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি, পৌরুষ (manliness) লাভই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্তাই আমি জগতে প্রচার করিতেছি। যদি অন্যায় কর্ম করিতে হয়, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হইতে হয় তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও।"

স্বামীজি লণ্ডনে পৌঁছিয়া কয়েক দিন পরেই আমেরিকা হইতে পুনঃ পুনঃ আহূত হইয়া সেখানে গমন করিলেন। এই সমুদ্র-যাত্রার কথা স্বামীজির এক শিষ্যা অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন। "সমুদ্রবক্ষে এই দশটি দিনের স্মৃতি কখনও ভুলিবার নহে। প্রত্যহ প্রভাতে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং কখনও সংস্কৃত কবিতা ও কাহিনীর আবৃত্তি ও অনুবাদ শ্রবণ করিতাম, কখনও বা প্রাচীন বৈদিক প্রার্থনা-মন্ত্রসমূহ পাঠ হইত। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র—চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি···

"একদিন জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীর উজ্জ্বল রূপরাশি, ঊর্দ্ধে স্বর্ণবর্ণ পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল—তন্ময় হইয়া এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "কবিতার সার সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে—কবিতা আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন কি?"

আমেরিকায় পৌঁছিয়া এবার স্বামীজি শিষ্যগণের সাহায্যে নিউইয়র্ক, ক্যালিফর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে বেদান্ত প্রচারের কয়েকটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তারপর নানাস্থানে বক্তৃতা ও অনুরাগী ভক্তদের লইয়া ক্লাস চলিতে লাগিল। কালিফর্ণিয়াতে এবার স্বামীজি অনেকদিন ছিলেন। এখানে তাঁহার প্রচারকার্য্যও অত্যন্ত সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই অক্লান্ত কর্মযোগীর চিত্ত এই সময়ে এক অব্যক্ত শান্তির ভাবরাজ্যে ডুবিয়া যাইত। এই ভাবের আভাস একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন "কর্ম করা সব

সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়, আর আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

"লড়াইএ হারজিত দুইই হল—এখন পুঁটলী পোঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরো নাইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।

"সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে—চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস।"

এই সময়ে ফরাসী রাজধানী প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী ও ধর্মেতিহাস-সভার অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছিল। স্বামীজি উহাতে আহূত হইয়া ১৯০০ সালের ২০শে জুলাই প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সভায় স্বামীজি সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের হিন্দুধর্ম বিষয়ক অনেক ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া স্বামীজি এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের ক্রম-অভিব্যক্তির ইতিহাসও তিনি বিবৃত করিয়াছিলেন। প্যারিসে প্রায় তিন মাস কাটাইয়া স্বামীজি অবশেষে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিরিবার পথে ভিয়েনা, এথেন্স, কনষ্টান্টিনোপল, কায়রো প্রভৃতি সহর দেখিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। ১৯০০ সালের ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে হঠাৎ বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না।

শেষ জীবন

বেলুড় মঠে পৌঁছিয়াই স্বামীজি আলমোরায় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে চলিয়া গেলেন। সেখানকার এই নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পরিচালক সাধুহৃদয় সেভিয়র সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহার সহধর্মিণীকে সান্ত্বনা দেওয়া এক মস্ত কাজ ছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারতের' পরিচালনা সম্পর্কেও তাঁহার তথায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই সকল কাজ সত্বর সমাপ্ত করিয়া স্বামীজি শীঘ্রই বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন। এই ভ্রমণযাত্রায় স্বামীজি ঢাকা, লাঙ্গলবন্ধ, দেওভোগ (নাগ মহাশয়ের বাড়ী), চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা ও শিলং প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া আসিলেন।

এই সময় হইতে স্বামীজির বহুমূত্র রোগ প্রবল হইতেছিল। বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সর্বদা গুরুভাইদের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হইত। কিন্তু তাহা তিনি পারিয়া উঠিতেন না। দর্শনার্থীদের সহিত বেশী আলোচনা যাতে না হয় সেজন্য গুরুভাইগণ অনেক সময় বাধা দিতেন। এক একদিন স্বামীজি ইহাতে রুষ্ট হইয়া বলিতেন—"রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম! এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করবার জন্য প্রস্তুত হয় তা হলে আমার শ্রম সার্থক। পরকল্যাণে হ'লই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়। চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে বেঁচে থেকেই বা ফল কি, এরা কতদূরে থেকে কত কষ্ট করে আমার দুটো কথা শুন্‌বার জন্য এসেছে আর অমনি অমনি ফিরে যাবে? তোরা যা পারিস্ কর্; আমি জড়ের মত চুপ করে বসে থাকতে পারবো না!"

অসুস্থ শরীরেও স্বামীজির কর্মে বিরতি ছিল না। মঠের উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। মঠকে লোকপ্রিয় করিবার

জন্য স্বামীজি ১৯০১ সালে দুর্গাপূজা কালীপূজা প্রভৃতি প্রবর্তন করিলেন। এই সালের শেষভাগে স্বামীজি গরীব-দুঃখীদের দুর্দশার কথা বড় মর্মস্পর্শী ভাষায় একদিন এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। উপলক্ষ সৃষ্টি হইয়াছিল কতকগুলি গরীব সাঁওতাল মজুর দেখিয়া। এরা প্রতি বছরই মঠের জমি সাফ করিবার জন্য আসিত। ইহাদের সুখদুঃখের কথা কথা শুনিতে শুনিতে স্বামীজির চোখ সজল হইয়া উঠিত। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাই একদিন বলিলেন—

"আহা, দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেহই ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথরমুদ্দ-ফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে। এই দেখ্‌না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি কেবল পেটের দায়ে ক্রীশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বল্‌ছি—ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ। কেবল ছুঁৎমার্গীর দল। অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার লাথি। ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে, এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস' বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারীর কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশনবসনের সংস্থান কর্‌তে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস্। একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল

থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহ নিশ্চিত জানবি।”

১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠে দুইজন জাপানী পণ্ডিত আগমন করেন। স্বামীজি তাঁহাদের সহিত বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে যান। বুদ্ধগয়া থেকে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য কাশীধামে গমন করেন। এই সময়ে কাশীতে কয়েকজন যুবক স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বামীজি তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করিয়া উৎসাহিত করিয়া আসিলেন। পরবর্তী কালে উহাই কাশীর বিখ্যাত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাশীতে কিছুকাল থাকিয়া স্বামীজি বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরের জন্মোৎসবও নিকটবর্তী হইয়াছিল।

মহাপ্রয়াণ

দিন দিনই স্বামীজির শরীরের অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক হইতেছিল। ঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইল। কিন্তু স্বামীজির অনুপস্থিতি যেন উহার উপরে একটা বিষাদের ছায়াপাত করিয়াছিল। ইহার পর স্বামীজি যে কয়দিন বাঁচিয়া ছিলেন দৈনন্দিন কার্য হইতে কোন দিন বিরত হন নাই। শেষের দিনও মধ্যাহ্নে শিষ্যদিগকে যথানিয়মে ব্যাকরণ পড়াইলেন। তারপর বিকাল বেলা স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বেড়াইয়া বেড়াইয়া গল্প করিলেন। সন্ধ্যার পর নিজের কক্ষে আসিয়া ধ্যানে বসিলেন কে জানিত, ইহাই মহাপুরুষের শেষ ধ্যান? রাত্রি নয়টার সময় ধ্যানযোগে স্বামীজি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেদিন ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই।

"মঠের সম্মুখে উঠানে স্বামীজির মৃতদেহকে স্থাপন করা হইল। একটি বিরাট্ জনতা চারিদিকে জড় হইয়াছে। স্বামীজির বদনমণ্ডল যুবকের মত দেখাইতেছিল। তাঁহার মুখ অনাবৃত ছিল যেন তিনি ঘুমাইয়া আছেন। তাহার বয়স চল্লিশেরও কম। সন্ন্যাসীরা স্তব্ধভাবে সারি সারি দাঁড়াইয়াছিল।

"বিদায় প্রার্থনা খুব সংক্ষিপ্ত। একজন সন্ন্যাসী একটি মসলিন কাপড়ের উপর পায়ে আলতা দিয়া স্বামীজির পদচিহ্ন তুলিয়া লইলেন। প্রদীপ লইয়া মৃতদেহকে আরতি করা হইল। মন্ত্র উচ্চারিত হইল ; ধূপ জ্বালান হইল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করা হইল।

"তারপরে একটি ছোট শোভাযাত্রা করিয়া স্বামীজির মৃতদেহ সন্ন্যাসীরা ধীরে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। "জয় গুরুজী মহারাজ কি জয়" ধ্বনিতে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"মঠের দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষের তলদেশে শবাধারটি নামান হইল। আর একটু নীচের দিকে গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে একটি সুসজ্জিত চিতাশয্যা নির্মাণ করা হইল। এই স্থানটি স্বামীজি নিজেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।"

ভগিনী নিবেদিতা একটি বৃক্ষের তলে বসিয়াছিলেন। চিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাতাস উঠিল, চিতাভস্ম বাতাসে উড়িতে দেখা গেল। এই চিতাগ্নির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধ্যানস্থ হইলেন। উপাধ্যায় ঠিক এর আগের বছরে নবপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে গাছতলায় বসিয়া উপনিষদ পড়াতে শুরু করেন। তিনি সেইদিনই হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া স্বামীজির দেহত্যাগের সংবাদ পান। শুনিবামাত্র দৌড়াইয়া তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। ধ্যানী উপাধ্যায়ের মনে কে যেন প্রেরণা জাগাইয়া বলিল, "তুমি তোমার যতটুকু শক্তি আছে, তাই দিয়া বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত গ্রহণ কর।"

চিতার আগুন নিভিলে ভগিনী নিবেদিতাও এই কথা বলিতে বলিতে ধীর পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন, "স্বামীজি আমাকে একটি কাজের ভার দিয়াছেন। আমাকে উহা করিতে হইবে।"

নিবেদিতা ও ব্রহ্মবান্ধব উভয়েই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা নবযুগের নবীনেরা কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে ? ওঠ, মাথায় সেই গুরুভার বহন করিয়া অগ্রসর হও।

মহাপুরুষ মহাপ্রয়াণ করিলেন, কিন্তু বাংলায় এক নবযুগের পত্তন করিয়া গেলেন। তাই স্বামীজি নবযুগের যুগাচার্য তিনি চাহিয়াছিলেন—A band of young Bengalees—সেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মকুশল একদল ত্যাগী বাঙালী যুবক, যাদের স্নায়ুগুলি ইস্পাতের মত মজবুত হইবে, পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় হইবে এবং যাদের ভিতরে একটি বজ্রকঠোর মন ঠাঁই পাইবে মহাপুরুষের সে বজ্র-নির্ঘোষ আজ রহিয়া রহিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে—স্বামীজির সে চাওয়ার আজও শেষ হয় নাই। বাংলায় আজও সে সত্ত্ব-পূত রজঃশক্তি জাগ্রত হয় নাই—সে নিঃস্বার্থ, পুণ্যব্রত ক্ষত্রজাতি গড়িয়া উঠে নাই। বাঙালীর এই ভাঙা-গড়ার যুগে স্বামীজির ত্যাগোজ্জ্বল কর্মাদর্শই বাঙালীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে বাঙালীর বাঁচিবার ইহাই একমাত্র পথ—অন্য পথ আর নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই ত্যাগী যুবকের দলই সারা জগতে নিপীড়িত মানবের দুঃখ মোচনে আত্মাহুতি দিবে। তাহারাই নূতন দুনিয়া গড়িয়া তুলিবে।

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম জীবন

অরবিন্দ শুধু দেশপ্রাণ 'দেশবন্ধু' নহেন, তিনি মনীষী, তিনি সত্যদ্রষ্টা, তাই তিনি ঋষি। অসাধারণ তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা। পৃথিবীতে এত বড় পণ্ডিত বিরল। কিন্তু মনীষার সঙ্গে সত্যদর্শনের মিলন সর্বত্র দেখা যায় না। অরবিন্দে তাহাই ঘটিয়াছে। অরবিন্দ সত্যদ্রষ্টা মনীষী। অরবিন্দ তাঁহাদেরই একজন যাঁহারা বহু সহস্র বর্ষ পূর্বে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা শহরে অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণধন ঘোষ কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। অরবিন্দের মাতা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু সেকালের একজন বিখ্যাত স্বদেশী নেতা ছিলেন। তখন বাংলায় একটা ভাঙা-গড়া চলিতেছে। সমগ্র জাতি একটা আবর্তের মধ্য দিয়া যাইতেছে। সেই সময় রাজনারায়ণ জাতি গঠনে স্থপতির কাজ করিয়াছেন। ধর্ম, সমাজ, নীতি, স্বদেশ—সব-কিছু উন্নতির জন্য তিনি আমরণ খাটিয়া গিয়াছেন। সত্যই তিনি ছিলেন 'জাতীয়তার পিতামহ।' সে-যুগে এমন স্বাদেশিকতা খুব কম লোকেই দেখা গিয়াছে। বাঙালীকে সবদিক্ দিয়া বড় ও মহৎ করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প। ভারতীয় আদর্শ ও সভ্যতা তাঁহার চোখে অপরূপ মহিমা-মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছিল। অরবিন্দের স্বদেশ-প্রেম এই বৃদ্ধ মনীষীর অবদান।

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ সাধারণ্যে ডাঃ কে ডি ঘোষ নামে সুপরিচিত ছিলেন। সহরে তাঁহার পশার-প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট তবু ডাক্তারি বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভের জন্য তিনি এই প্রাপ্ত বয়সে বিলাত গমন করিলেন। সেখানে আই-এম্-এস প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন বিলাতে থাকিতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি পুরাদস্তুর সাহেব। এই পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি তাঁহার বাকী জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। তিনি ছেলেপিলেদিগকে সাহেবী শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। দার্জিলিং সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে অতি অল্প বয়সেই অরবিন্দকে ভর্তি করিয়া দিলেন। এই স্কুলে অরবিন্দকে য়ুরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বালকদের সঙ্গে একত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইত। তাঁহার পিতার ইচ্ছা, বিদেশী আবহাওয়ায় থাকিয়া ছেলেও য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হইতে পারিবে।

দার্জিলিংএ অরবিন্দ দুই বছর অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তাঁহার পিতা ছেলেদিগকে লইয়া বিলাত গমন করেন। সঙ্গে অরবিন্দের মাতাও গিয়াছিলেন। তখন অরবিন্দের বয়স মাত্র সাত বছর। এই সময়ে ইংলণ্ডেই অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। অরবিন্দেরা চারি ভাই। তাঁহার বড় দুই ভাই। তন্মধ্যে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি খুব বিদ্বান্ লোক ছিলেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

অরবিন্দ কিছুকাল ম্যাঞ্চেষ্টারে পড়েন। তারপর লণ্ডনের সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বিলাতে থাকিতে অরবিন্দের জীবন বড় স্বচ্ছল অবস্থায় কাটে নাই। ডাঃ কৃষ্ণধন যদিও যথেষ্ট উপার্জন করিতেন, কিন্তু তাঁহার বদান্যতা ও সাংসারিক অনভিজ্ঞতার

জন্য অনেক সময় অত্যন্ত অভাবে পড়িতে হইত। অরবিন্দ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যে বৃত্তি পাইতেন তাহাতে তাঁহার অনেক কষ্টের লাঘব হইত। উহাতেই তাঁহার নিজের খরচ চলিয়া যাইত।

১৮৯০ সালে অরবিন্দ আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বছর। এই পরীক্ষায় তিনি সমস্ত বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহণে অপটু বলিয়া তিনি আই-সি-এস্ হইতে পারিলেন না। এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা নাকি ঘটিয়াছিল। অরবিন্দ যেই মাত্র ঘোড়ায় চড়িতে ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি কি যে হইল, অরবিন্দ এক পা-ও নড়িতে পারিলেন না। কে যেন তাঁহাকে অজ্ঞাতভাবে আটকাইয়া রাখিল। ইহাতে বিধাতার কি ইঙ্গিত আছে কে জানে? আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অরবিন্দের জীবন সম্পূর্ণ পৃথক পথে অতিবাহিত হইত। তিনি সরকারের একজন বড় কর্মচারী হইতে পারিতেন, কিন্তু মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি অরবিন্দকে হয়ত দেশ পাইত না।

আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অরবিন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছিলেন একজন ইংরেজ যুবক। তাঁহার নাম মিঃ বিচক্রফ্‌ট। গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বিচক্রফ্‌ট দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অরবিন্দ যখন রাজদ্রোহ অভিযোগে অভিযুক্ত সেই সময়ে এই বিচক্রফ্‌ট সাহেব তাঁহার বিচার করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের কি পরিহাস! এককালে যাঁহারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে বসিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই একজন বিচারক, অপর জন তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান শৃঙ্খলিত আসামী।

আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দ কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে বৃত্তিধারী ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই অরবিন্দকে সম্পূর্ণরূপে কলেজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পড়াশুনা চালাইতে হইত।

১৮৯২ সালে তিনি ক্লাসিক্‌সের ট্রাইপোসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দকে অর্থোপার্জনের জন্য চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইল। সৌভাগ্য ক্রমে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে বরোদার গাইকোয়ার ইংলণ্ডে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার একজন কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারীর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। অরবিন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত পদপ্রার্থী হইলেন। বরোদা-রাজ অনতিবিলম্বে তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। তারপর ১৮৯৫ সালে বরোদা-রাজের সঙ্গে অরবিন্দ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। যখন তাঁহার বয়স একুশ বছর।

অরবিন্দ চৌদ্দ বছর বিলাতে ছিলেন। তাঁহার এই সময়কার জীবনের কথায় বড় একটা জানিবার উপায় নাই। যখন তিনি বরোদায় আসিলেন, তখন তিনি একজন রীতিমত সাহেব। তাঁহার বেশভূষা, কথাবার্তা, চাল-চলন কোন কিছুতেই একজন ইংরেজ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করা যাইত না। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাঁহার জীবনে বাল্যকাল হইতেই আসন লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞানধারা তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে অত-বড় পণ্ডিত কমই দেখা যায়।

বাহিরে অরবিন্দ সম্পূর্ণ সাহেব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতরটি ছিল খাঁটি ভারতীয় আদর্শে ভরপুর। বরোদায় আসিয়া তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য হইল ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র সব-কিছুকে আপনার করিয়া লইয়া একান্ত অধিগত করা। তিনি বার বছর বরোদায় ছিলেন। এই বার বছর তাঁহার জীবনের একটা মাহেন্দ্র যুগ বলিতে হইবে। এই দীর্ঘকাল তিনি একান্ত মনে নিজের জীবন-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং কালক্রমে স্বদেশের জ্ঞানগৌরব ও তপস্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে স্বদেশসেবায় নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত

উপকরণ এই সময়ে নিজের জীবনে তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিতেছিলেন। এই জন্যই অরবিন্দের বরোদায় অবস্থিতি তাঁহার জীবনের একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। বরোদায় রাজসরকারে নানা বিভাগে কাজ করিয়া অবশেষে তিনি বরোদা কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল পদ লাভ করেন। মাসিক ৭০০৲ টাকা বেতনে তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজের ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। অরবিন্দের গভীর ও বিশাল চোখ দুইটিতে কী যে মায়া ছিল, উহা সকলকেই আকর্ষণ করিত। বোম্বাই প্রদেশের ছাত্র-সমাজের উপর অরবিন্দের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বরোদা-রাজ অরবিন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

এখানে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব বড় বিশেষ কেহ ছিল না। অরবিন্দ চিরদিনই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। নীরবে তাহার আত্ম-সাধনা চলিতেছিল। বেদ, উপনিষদ, ষড়্‌দর্শন, গীতা, পুরাণ সমস্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতেছিলেন। অরবিন্দ শুধু পাণ্ডিত্যাভিলাষী ছিলেন না। উচ্চতম সত্যসমূহ জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে 'লেলে' নামক এক মহারাষ্ট্র যোগীর সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। লেলের নিকট তিনি যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বাঙালী হইলেও অরবিন্দ বাংলা জানিতেন অতি সামান্যই। বরোদা থাকিতে তিনি বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁহাকে বাংলা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

স্বদেশী যজ্ঞে

১৯০৫ সাল। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। যৌবনের প্রথম আবেগের মত দেশপ্রেমের প্রথম অভ্যুত্থানে জাতির প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নির্যাতিতের ক্ষুব্ধ চিত্ত কোটি কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। তিনি আদেশ করিয়াছেন, বাংলাকে দুই টুক্‌রা করিয়া ফেলিবেন—বাঙালীকে বিভক্ত করিবেন। এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে বাঙালী প্রতিবাদ জানাইল। পূর্ববঙ্গবাসী ও পশ্চিম বঙ্গবাসী, ভাই ও বোন সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধ পবিত্র মনে একত্র মিলিত হইল, পরস্পরের হাতে রাখী পরাইয়া দিল। রবীন্দ্রনাথ স্বস্তি বচন আবৃত্তি করিলেন—

"বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন্
এক হউক, এক হউক
এক হউক, হে ভগবান্।"

সেদিন কাহারো ঘরে আগুন জ্বলিল না—সেদিন অরন্ধন। সকলেই উপবাসী থাকিয়া মাতৃব্রতে দীক্ষা লইল। ৩০শে আশ্বিন আজও আসে যায়—কিন্তু সেদিন যে প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমন আর কেহ দেখে নাই। অক্ষম দুর্বল নিরস্ত্র বাঙলা সেদিন এমনি করিয়াই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছিল—স্বদেশের পায়ে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিল।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া বাঙালী রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। হাতে তাহার হাতিয়ার বয়কট ও স্বদেশী। ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি পাপ বলিয়া বাঙালী দূরে ঠেলিয়া দিল, মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইল।

বাংলায় যখন এমনি স্বদেশ-প্রেমের বন্যা ছুটিয়াছে, তখন অরবিন্দ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই শুভ মুহূর্তের জন্য তিনি এতদিন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় নিজেকে তৈরী করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা জুড়িয়া যখন স্বদেশ-প্রেমের ঢেউ উঠিল, অরবিন্দ বুঝিলেন, এই ঝঞ্ঝার বেশেই ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই আদেশ মাথায় করিয়া তিনি সেই ঝড়ের মুখে পাকা মাঝির মত বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে হাল ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

১৯০৬ সালের জুলাই মাসে তিনি বরোদার সম্মানীয় পদ ত্যাগ করিয়া বাংলায় চলিয়া আসিলেন, ফকিরের বেশে স্বদেশ-সেবার কাণ্ডারী সাজিলেন। এতদিন পরে অরবিন্দের আকৈশোরের সঙ্কল্প রূপ পাইল।

অরবিন্দের এই স্বদেশ-সেবার আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান্ এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ এই রূপকে জাতির সাম্‌নে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশকে অরবিন্দ কি চোখে দেখিতেন, তাহা নিজেই লিখিয়াছেন: "অন্যলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না,

জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

দেশোদ্ধার কার্য তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। দেশের সেবা তাঁহার নিকট পুণ্য ও পবিত্র কার্য ছিল। পরম নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যের সহিত তিনি এই কার্যে পৌরোহিত্য করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সকল পরম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব বুঝে না, তাহাদের কথায় তিনি লিখিয়াছেন—

“বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুনিতে পারে না ; ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়।”

দেশ-সেবার এই উচ্চ ও মহান্ আদর্শ অরবিন্দই এদেশে সর্বপ্রথম প্রচার করেন। এই ভাব লইয়াই তিনি দেশ-সেবার কার্যে অবতরণ করেন।

বাংলা দেশে এই সময়ে স্কুল-কলেজগুলির উপর গবর্নমেন্টের রোষ-দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সার্কুলারের পর সার্কুলার জারি করিয়া ছেলেরা যাহাতে কোন রাজনৈতিক শোভাযাত্রা ও সভাসমিতিতে যোগদান না করে তাহা ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু ছেলেকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে হইল। দেশে তীব্র অশান্তি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। এই সময়ে কলিকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার অধীনে দুইটি ন্যাশনাল কলেজ খোলা হইল—একটি কলিকাতায় ও অন্যটি রংপুরে। অরবিন্দ বাংলায় আসিয়াই কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করিলেন। বাঙালী নত মস্তকে অরবিন্দকে স্বদেশ যজ্ঞে বরণ করিয়া লইল।

কিন্তু শীঘ্রই জাতীয়-শিক্ষা-সংসদের সঙ্গে অরবিন্দের মনোমালিন্য ঘটিল। এই শিক্ষা-সংসদের পুরাতন-পন্থী সভ্যগণ জাতীয়

শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকেই নূতন কাঠামোতে রূপায়িত করিয়া তোলাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। অরবিন্দ এই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"The mere inclusion of the matter of Indian thought and culture in the field of knowledge does not make a system of education Indian, and the instruction given in Bengal National College was only an improved European system not Indian or National." কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্যের জন্য অরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অরবিন্দ উচ্চ ও পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শ অন্তরে পোষণ করিতেন।

ইহার পর অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এই সূত্রে সমগ্র দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থ-সাহায্যে কিছুকাল পূর্বে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাখানি প্রচার করিতেছিলেন। এক্ষণে অরবিন্দের মত সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ লোক পাইয়া, উহার পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। এই জন্য একটি যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অরবিন্দ উহার একজন ডিরেক্টর হইয়া পত্রিকার সম্পাদনকার্য চালাইতে লাগিলেন। অরবিন্দের হাতে পড়িয়া, 'বন্দে মাতরম্' যেন এক দিনে বাঙালীর হৃদয়াসন জুড়িয়া বসিল। অরবিন্দের ভাষা যেমন ওজস্বিনী, তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি ভাবময়। স্বদেশ-হিতৈষণার কী সে আবেগ—কী সে উচ্চ ও গভীর ভাব। অরবিন্দের লেখনী-প্রভাবে বাংলায় এক নব প্রেরণা সঞ্চারিত হইল। বাঙালী এক নূতন জাতি হইয়া দাঁড়াইল। 'বন্দে মাতরম্' দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। উহা

সমগ্র ভারতে পঠিত হইত। অরবিন্দ স্বরাজ অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই 'বন্দে মাতরমে' প্রচার করিতেন। এই সময়ে কংগ্রেসে মডারেট বা নরম পন্থীদের আধিপত্য। অরবিন্দের লেখনীর ফলে কংগ্রেসে জাতীয় দল সুগঠিত ও পরিপুষ্ট হইল। ১৯০৭ সালে মেদিনীপুর জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে অরবিন্দ জাতীয় দলের নেতৃরূপে যোগদান করিলেন। এইখানেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে মডারেটদের সঙ্গে জাতীয়দলের বিরোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তারপর ঐ সালেই সুরাট কংগ্রেসে এই দুই দলের মধ্যে রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল। সুরাট কংগ্রেসের পর অরবিন্দ বোম্বে ও মধ্য প্রদেশে বক্তৃতা দিয়া বাংলায় আসিলেন।

ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ আলিপুরের ষড়্যন্ত্র মামলা। ১৯০৮ সালের ৩০শে মে গভীর রাত্রিতে অরবিন্দের কলিকাতার গৃহে পুলিশ কর্মচারীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া পুলিশ আফিসে নিয়া গেল।

এই মামলায় অরবিন্দ প্রমুখ সর্বশুদ্ধ উনচল্লিশ জন আসামী ছিলেন। এক বছর ধরিয়া এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দেশবন্ধুর বক্তৃতার শেষ কথাগুলি আজও যেন কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে—"Long after the controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationallism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-

echoed not only in India, but across distant seas and lands."

"এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হইবার পরে, তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, মানুষ তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার বার্তাবহ এবং মানবপ্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বাণী ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হইবে শুধু ভারতে নয়, দেশদেশান্তরেও।"

দেশবন্ধুর অন্তর্দৃষ্টি সেদিন যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে।

এই মোকদ্দমা যখন আলিপুর দায়রায় সোপর্দ হইয়াছিল, সেই সময়ে বিচারপতি ছিলেন মিঃ বিচ্‌ক্রফ্‌ট। ইহার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি।

দেশবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যৌক্তিকতায় অবশেষে অরবিন্দ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই দীর্ঘ এক বৎসর কাল অরবিন্দের অধ্যাত্ম জীবনগঠনে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। জেলখানাই ছিল তাঁর তপস্যা-ক্ষেত্র। তাঁহার এই তপঃকাহিনী ও ভাগবত অনুভূতির কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। অনেক পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, একমাসের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।"

এই সময়ে বন্দী অরবিন্দের বন্দনা-গীতি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

“অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি।
তোমা লাগি’ নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি’
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি’
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ব-বাধা-হীন,—
যার লাগি নর-দেব চির-রাত্রি-দিন
তপোমগ্ন ;······
সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।”

অরবিন্দের এই জয়গাথা গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন—

‘জয় তব জয়
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল?
মোছ রে, দুর্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল।
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে

পারে শাস্তি দিতে ? বন্ধন-শৃঙ্খল তা'র
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার,
কারাগার ক'রে অভ্যর্থনা ।"

শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলনের যে দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উহা জাতির চল্‌তি পথের গতিনির্দেশে সহায়তা করিবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সত্ত্বগুণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না ; এমন কি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সত্ত্বগুণের মুখ্য ফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে এক শ' ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্বগুণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য।

"ভগবান্ অধুনা ধর্মের পুনরুত্থান করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্মোপদেশক মহাত্মগণ সত্ত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

"দেশে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা ; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবে।"

একদিন কংসের কারাগারে ভগবান্, বসুদেব ও দেবকীকে দর্শন দিয়া নয়ন জুড়াইয়াছিলেন, আর সেদিন দুর্ভেদ্য লৌহনিগড়ে বন্দী শ্রীঅরবিন্দকেও দেখা দিয়াছিলেন তাঁহার ঈপ্সিত দেবতা। এই ভাগবত সান্নিধ্য লাভ করিবার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইহার পর তাঁহার স্বাদেশিকতায় ধর্মভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখা গিয়াছে। তিনি এই নূতন বাণী প্রচার করিলেন দুইখানি সাপ্তাহিকের ভিতর দিয়া—একখানি ইংরেজী, নাম 'কর্মযোগিন্'; অপরখানি বাংলা, নাম 'ধর্ম'। দেশসেবায় অধ্যাত্ম-চেতনা বাংলার প্রাণে প্রাণে এক নববিদ্যুৎধারা সঞ্চারিত করিয়া দিল। অরবিন্দ যে জাতীয়তার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা ধর্মভাবে অনুরঞ্জিত, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা বলপ্রদ ও প্রেরণাদায়ক। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"Nationalism is a religion that comes from God. Nationalism cannot die, because it is God who is working in Bengal. God cannot be killed, God cannot be sent to gaol."

জাতীয়তাও ধর্ম, ইহা ঈশ্বরের দান। জাতীয়তার মৃত্যু নাই, কারণ বাংলাদেশে ঈশ্বরের শক্তিই কাজ করিতেছেন। ঈশ্বরকে হত্যা করা যায় না, ঈশ্বরকে কারাদণ্ড দেওয়া যায় না।

পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের জাতীয় দলের নেতৃত্বও করিতেছিলেন। ১৯০৯ সালে হুগলীতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনে তাঁহারই কর্মোৎসাহে জাতীয় দলের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে কেহ কথাটি বলিতে পারে নাই। ইহার পর তিনি পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। সেই সময়ে ঝালকাঠীতে বরিশাল জিলা সম্মেলনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা তাঁহার ভাগবত অনুভূতির পরিচায়ক। সেই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন—

"ভগবানের হাতুড়ির নীচে আমরা লোহার মত। তিনি আমাদিগকে যে আঘাত করেন, সে আঘাত আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নহে, আমাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। নিপীড়নের ভিতর দিয়াই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হইব।"

যোগাশ্রমে

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দ সুদূর দক্ষিণ ভারতের ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে চলিয়া গেলেন। ভগবানের ডাক তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছিল। দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই তপঃসাধনায় ব্রতী ছিলেন। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তাঁহার কথা কেহ শুনিতে পাইলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে দেশবাসী কিছু জানিতেও পারিল না। পণ্ডিচেরীতে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তপস্যায় মগ্ন আছেন, লোকে শুধু ইহাই জানিতে পারিল। ১৯১৪ সালে য়ুরোপে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে অরবিন্দের উদাত্ত কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল অমৃতের বাণী। ১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজী দার্শনিক্ মাসিক পত্র 'আর্য' প্রকাশিত হইল। 'আর্যে'র বাণী সারা বিশ্বের বাণী—ভারতের জাতীয়তা অরবিন্দের তপস্যা প্রভাবে বিশ্বের কল্যাণকর রূপে প্রকট হইল। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উচ্চতম সত্যসমূহ যাহা সাধনার অভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, অরবিন্দের যৌগিক সাধনায় উহা নবরূপ লইয়া 'আর্যে' প্রকাশিত হইতে লাগিল। অরবিন্দের প্রত্যেকটি লেখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর অনুভূতি একসঙ্গে বিদ্যমান।

"পূর্ণ সাত বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস [illegible] 'আর্য' লিখিয়াছেন; বলিতে গেলে একাই ইহার পাতাগুলি পূর্ণ করিয়াছেন। আর কত বিষয়েই না প্রবন্ধ!—বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য জীবনের আদর্শ, যোগসমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব-সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—ইহা ছাড়া সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে কত

হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। 'আর্য' শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহাগ্রন্থ নহে, যোগজীবনের রহস্যজ্ঞাপক নহে, ধর্মালোচনা নহে—ইহা মানব-ইতিহাস অনুধাবন করিবার পরম সহায়। সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনা আর্যে স্থান পায় নাই, কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার যে অপূর্ব বিশ্লেষণ আছে তাহার তুলনা নাই। ত্রিংশ-অধিক বৎসর পূর্বের সেই ইঙ্গিতগুলি আজকালকার বাস্তব ঘটনা।"

'আর্যে' ঋগ্বেদ আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় অরবিন্দ যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কি যুক্তির দিক্ দিয়া কি সাধকের অনুভূতির দিক্ দিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা এক অমূল্য দান। এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পৃথিবীতে বিরল।

ঋগ্বেদ হিন্দুদের নিকট অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয়। ইহা হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি। অথচ আধুনিক কোন ব্যাখ্যাতেই ইহার ভিতরের গূঢ় অর্থ প্রকট হয় না এবং তাহা না হইলে বেদকে এরূপ উচ্চস্থানও দেওয়া চলে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আর সায়নাচার্য দিয়াছেন উহার যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা। শ্রীঅরবিন্দই 'আর্য' পত্রিকায় সর্বপ্রথম বেদের আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। ইহাতে সমগ্র বেদের নিগূঢ় অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

তাঁহার 'দিব্য জীবন' (Life Divine) ও 'যৌগিক সামঞ্জস্য' (Synthesis of Yoga) নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে মানব জীবনকে ভাগবত জীবনে পরিণত করিবার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। এই ভোগায়তন দেহকে কিরূপে যোগায়তন করিয়া তদ্দ্বারা ভাগবত অনুভূতির চরমে পৌঁছা যায় এবং সেই শুদ্ধ ও শক্তিশালী জীবনকে পৃথিবীর হিতার্থে নিয়োজিত করা যায় তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ শুধু ভাবুক বা কল্পনা-বিলাসী ছিলেন না, তিনি নিজের জীবনে প্রত্যেকটি সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন।

অরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যা (Essays on the Geeta) এক অপূর্ব বস্তু। সাধনা-লব্ধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ইহা পরিচায়ক। এরূপ কর্মজ্ঞানভক্তির সমন্বয়মূলক অপূর্ব ব্যাখ্যা আর নাই।

পণ্ডিচেরীতে তপস্যারত অরবিন্দের মুখ হইতে বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে অনেক গভীর চিন্তাশীল কথা নিঃসৃত হইয়াছিল। উহার গোটাকয়েক কথা উল্লেখ করিতেছি।

"বাংলায় আছে ভক্তি, আছে কর্ম। নূতন সৃষ্টির জন্য তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, তোমরা তার সঙ্গে জ্ঞানকে সংযুক্ত কর। জ্ঞানের সাধনা যদি উপেক্ষা কর, সৃষ্টি যত বৃহৎ বলেই মনে কর না, উহা কোন মতেই স্থায়ী হবে না।

"পূর্ণ জ্ঞান চাই, নতুবা পতনের খুবই আশঙ্কা আছে। কর্ম ও ভক্তি বাংলার মাটীর গুণ, মানুষের দোষ এক্ষেত্রে কিছু নেই; সেইজন্য মাঝে মাঝে এই দুটোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞানের সাধনা কর্‌তে হবে।

"বাঙালীর বুদ্ধি আছে—কিন্তু উহা জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ক্ষিপ্র বটে কিন্তু গভীর নয়, বিরাট নয়। বুদ্ধি শান্ত গভীর বিরাটে পরিণত হ'লেই জ্ঞানের উদয় হবে। ভক্তি হতই প্রবল হোক্, জ্ঞান প্রদীপ্ত না হ'লে, ভাবচ্যুতি আস্‌বেই, সেজন্য বাঙালীকে জ্ঞানের দিকেই অধিক ঝোঁক দিতে হইবে।"

"শক্তি সব কর্‌ছে—আমি তার যন্ত্র, এই অনুভূতিই যোগের সবখানি নয়। সাধককে অনুভব কর্‌তে হবে যে, শক্তি সাধকেরই—পুরুষের ইচ্ছায় সাধকই কার্য ক'রে চলেছে। শক্তির সঙ্গে সাধকের অঙ্গাঙ্গী পরিচয় হ'লেই জ্ঞানের বিকাশ হবে।"

ধর্ম জিনিষটা অরবিন্দের নিকট জড় নয়, মৃত নয়, আচার অনুষ্ঠানমাত্র নয়। ধর্ম তাঁহার নিকট জীবন্ত, শক্তিপ্রদ। নীতিবাগীশের ধর্ম তাঁহার নয়, তাঁহার ধর্ম সত্য-সুন্দরের। এত বড়

জ্ঞানী-পণ্ডিত এত বড় যোগী তপস্বী বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়টি দেখা যায় নাই।

পণ্ডিচারীর নির্জন শান্ত ও উদার পরিবেশে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনার তপোভূমি রচিত হইল। ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম। সহায়হীন, সম্পদহীন, সর্বোপরি রাজরোষ—কিছুই শ্রীঅরবিন্দকে বিচলিত করিতে পারিল না। রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন—ভারতের মুক্তির ডাক তাঁহাকে আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না—ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী তাঁহাকে মহামানবের মুক্তি সাধনায় হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল। জাতীয় নেতাগণ তাঁহাকে আর ফিরাইয়া নিতে পারিলেন না, এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ তাঁহাকে আর আকৃষ্ট করিতে পারিল না। স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের পূর্বে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে নামাইতে পারিলেন না।

পণ্ডিচারী আশ্রমের যিনি শ্রীমা—সেই মহীয়সী ফরাসী মহিলা মীরা রিশার ও মঁসিয়ে পল রিশার মহাপুরুষের সন্ধানে পণ্ডিচারী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মিলিত হন। শ্রীমা মীরার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁহার গ্রন্থেই পরিস্ফুট। ইঁহারা আসিয়া 'আর্য' পত্রিকার পরিচালনায়ও সহায়তা করেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁহাদিগকে ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে হয় এবং পল রিশারকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে হয়। এই সময়ে 'আর্য' পত্রিকার একটি ফরাসী সংস্করণ বাহির হইত, তাহা বন্ধ হইয়া যায়। মহাযুদ্ধের শেষে ১৯২০ সালে তাঁহারা আবার পণ্ডিচারী আসেন এবং শ্রীমা আশ্রমেই থাকিয়া যান। শ্রীমার আগমনে আশ্রমটি এক বিরাট্ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। দেশবিদেশ হইতে সাধক-সাধিকাগণ আসিয়া আশ্রমে তপঃসাধনায় ব্রতী হইলেন। বর্তমানে আশ্রমে প্রায় ৭০০।৭৫০ অধিবাসী। ইঁহাদের সমস্ত ভার শ্রীমার

হস্তে। শুধু ইঁহাদের অন্তর্জীবনের দায়িত্ব নয়, ইঁহাদের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণের ভারও শ্রীমার ওপর। ইহা সহজ ব্যাপার নয়। আশ্রমের সাধক-সাধিকা বালক-বালিকাদের ভরণপোষণের জন্ম কোনদিন অর্থসাহায্য যাচ্ঞা করা হয় না। অযাচিতভাবে অর্থ আসিয়া থাকে। আশ্রমের কাজকর্ম বিভিন্ন বিভাগে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদী বৈদান্তিক নহেন। জগৎ তাঁহারই লীলাভূমি। কর্মকে কর্মযোগে উন্নীত করিয়া জীবনযাত্রা পরিচালনা করিতে হইবে। এই নিমিত্ত এখানকার অধিবাসীরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন কাজে নিয়োজিত আছেন। আশ্রমে প্রায় একশতটি বাড়ী। এখানের কাজগুলি নানাভাগে বিভক্ত— গৃহনির্মাণ ও সংরক্ষণ, ইটের কারখানা, স্যানিটারি, জল ও বিজলী বাতির বিভাগ, আসবাবপত্র তৈয়ারি, দরজি বিভাগ, জুতা বিভাগ, ধোবীখানা, আটা ও তেলকল, বাগান, চাষ-আবাদ, ছাপাখানা, প্রকাশালয়, লাইব্রেরী, চিত্রশালা, বিদ্যালয়, যানবাহন ইত্যাদি। এখানকার খাবার ঘরটি প্রকাণ্ড—একসঙ্গে হাজার লোক খাইতে পারেন। নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার পরিবেশ করা হয়। অতিথিশালা দুইটি বড় ও মনোরম। গোলকুণ্ডা নামক অতিথিশালাটি স্থাপত্যের দিক্ দিয়াও বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ভার শ্রীমার ওপর। তাঁহার ওপর ভার দিয়া শ্রীঅরবিন্দ একেবারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে যোগসাধনায় মগ্ন থাকিতেন—বৎসরে মাত্র চারিদিন তিনি আশ্রমের এবং বাহিরের অধিবাসীদের দর্শন দিতেন।

১৯২৮ সালের ২৯শে মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচারীতে যোগী শ্রীঅরবিন্দকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিয়া তিনি লিখেন—

"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম ইনি আত্মাকে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন; সেই তাঁর দীর্ঘ চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো

দিয়েই বাহিরের আলো জ্বালাবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোন খরদস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থ বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম—আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌বেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্‌বে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

"প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূলকথা তোমার আমার ব্যক্তিগত জীবনের মোক্ষ বা মুক্তি লাভ নয়, সমগ্র মানবের মোক্ষ লাভ। জীবনে ভাগবত শক্তির অবতরণে ইহা সফল হইবে। এই জন্যই প্রয়োজন আত্মসমর্পণ যোগ বা পূর্ণযোগ। যোগ বলিতে সাধারণতঃ আমাদের মনে সন্ন্যাসের কথা জাগে—সংসার ছাড়িয়া দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া অরণ্যবাস। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের লক্ষ্য হইল

পূর্ণ সত্যের অখণ্ড অনুভূতি—দেবজন্ম বা অতিমানবত্ব। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য মোক্ষ লাভ। এই সব প্রাচীন যোগপন্থা চাহিয়াছিল, "বিশ্বাতীত পরব্রহ্মের আনন্দঘন সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে। কিন্তু পূর্ণযোগ চায় ভগবানের প্রজ্ঞানঘন সত্তায় শাশ্বত স্থিতি লাভ করিয়া তাঁহারই লীলাসহচররূপে কর্মজীবন বরণ করিয়া নিতে। পূর্ণযোগের চক্ষে পৃথিবী শুধু সাধনভূমি নয়, সিদ্ধিরও ক্ষেত্র, কেননা পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করা পূর্ণযোগের লক্ষ্য। পূর্ণযোগীর উদ্দেশ্য দেহমনপ্রাণ পরিত্যাগ করা নয়, দেহমনপ্রাণকে বিজ্ঞানশক্তি দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া আমাদের সমস্ত জীবন ভাগবত ছন্দে লীলায়িত করিয়া তোলা।"

মহাপ্রয়াণ

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর এই মহাযোগী দেহরক্ষা করেন। এই সংবাদ এত আকস্মিক যে সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। পণ্ডিচারীর আশ্রমে পরম যোগীর গৌরকান্তি দর্শনের ভীড় জমিল। শ্রীমা আশ্রমের প্রধানদ্বার খুলিয়া দিলেন। দলে দলে দর্শনার্থীরা মহাপুরুষের কনককান্তি দর্শন করিল। পাঁচ দিন যাবৎ দেহের অপূর্ব জ্যোতি অম্লান ছিল। চিকিৎসকগণ এরূপ অভূতপূর্ব ঘটনা কখনও দেখেন নাই। অবশেষে মৃত্যুবিকৃতির লক্ষণ দেহে দেখা গেল ৯ই ডিসেম্বর। সেই দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আশ্রম প্রাঙ্গণে এই দিব্য দেহ সমাধিস্থ করা হইল।

শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পর আশ্রমে পূর্ণযোগের সাধনা শ্রীমা-ই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আশ্রমজীবনের সমস্ত কাজ তিনিই পরিচালিত

করিতেছেন। এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিয়াছে। ১৯৫১ সালের ২৪শে এপ্রিল এই উদ্দেশ্যে এক অধিবেশনে শ্রীমা বলেন—

"শ্রীঅরবিন্দ......তাঁর প্রতিভার সমগ্র সৃষ্টিশক্তি নিয়েই এই সর্ববিদ্যায়তন-কেন্দ্রের নির্মাণ উদ্যোগ পরিচালনা করছেন। বহু বৎসর ধরে তিনি মনে করে আসছিলেন যে এই উপায়েই ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে যাতে অতিমানস-জ্যোতি গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়। এই জ্যোতিই বর্তমানের শ্রেষ্ঠদের গোষ্ঠীকে নূতন এক জাতিরূপে পরিণত করবে, যার ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ হবে নূতন আলো, নূতন শক্তি, নূতন জীবন।"

অরবিন্দের যোগসাধনা মানবজাতির ব্যাপক দিব্য রূপান্তরের সাধনা। মানুষের মহামিলনের জন্যই মানুষের দিব্য রূপান্তর চাই। মানুষী প্রকৃতিতে ব্রাহ্মীশক্তির অবতরণদ্বারা মানুষকে উন্নীত করিতে হইবে—সেই দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইলে অখণ্ড জগৎ (one world) গড়িয়া উঠিবে, বেদের বাণী—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মানুষে মানুষে সকল ভেদবিরোধ দূর করিয়া প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করিবে। বর্তমান যুগস্রষ্টা মহামানব রামমোহনের যে বিশ্বমানবতার বাণী—তাহাই শতাব্দীর 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার' মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে বাংলার নবযুগের ঋষিদের ভিতর। শ্রীঅরবিন্দের সহজাত যোগৈশ্বর্য মানুষকে দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়াছে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই বেদবাণী তাঁহার জীবনে মূর্ত হইয়াছে। বিশ্বমানবের মুক্তি ও ঐক্য সাধনায় মহাযোগী আত্মদান করিলেন। তাঁহার তপস্যা কি ব্যর্থ হইবে?